বাংলাদেশের নির্বাচিত

রম্যরচনা ও গল্প

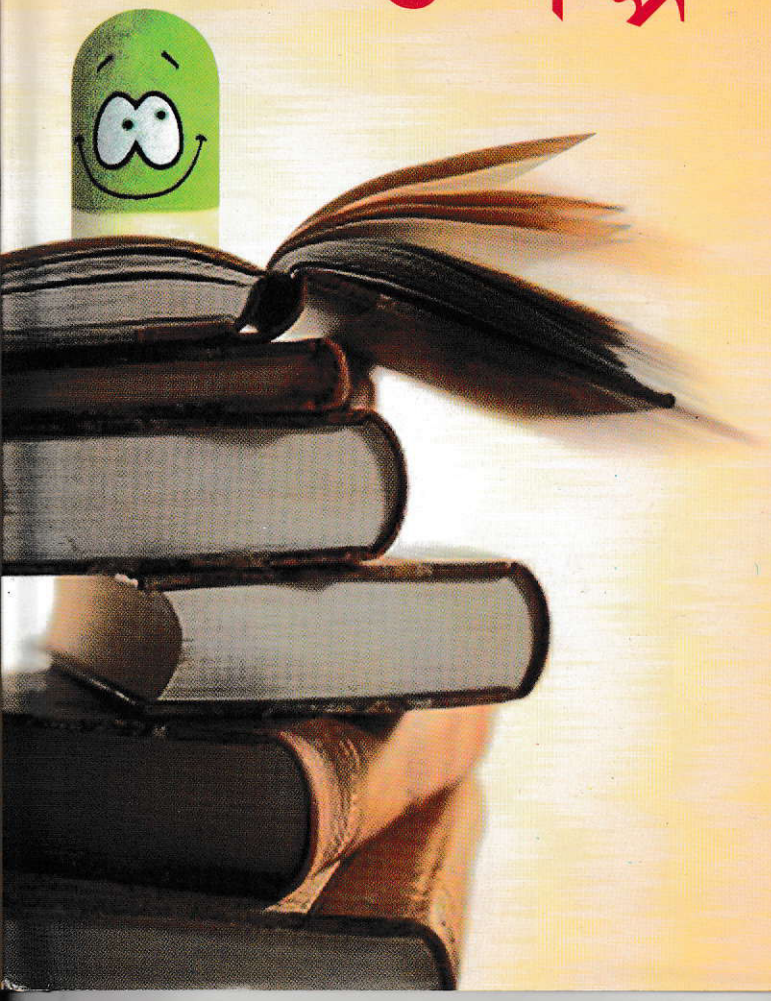

আলোকিত মানুষ চাই

বাংলাদেশের নির্বাচিত রম্য রচনা ও গল্প

সম্পাদনা ॥ আহমাদ মাযহার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৬৪

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ভাদ্র ১৩৯৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

তৃতীয় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ
আষাঢ় ১৪১৮ জুন ২০১১

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৬৭ নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
শেখ তোফাজ্জল হোসেন-এর আঁকা ছবি অবলম্বনে
আহমাদ মাযহার

মূল্য
একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0063-2

ভূমিকা

১.

বাংলা ভাষায় *রম্যরচনা* শব্দটি উচ্চারিত হলে আমাদের মনে চকিতে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে এগুলো এমন একধরনের রচনা যা হাস্যরস নির্ভর। কথাটা বিচার সাপেক্ষ হতে পারে তবু এ-কথাও স্বীকার না করে পারা যাবে না যে সাধারণভাবে বাঙালি মানসে *কৌতুকরস* বা *হাস্যরসের* মর্যাদার আসন নেই। ফলে অনেক শক্তিমান হাস্যরসের স্রষ্টাও কিছুটা দ্বিধান্বিতভাবে এই ধারায় সৃষ্টিশীল থেকেছেন। *হাস্যরস* সম্পর্কে বাঙালির এ-ধরনের মনোভাবের উৎস কী তা অন্যত্র বিবেচ্য। হাস্যরসকে মর্যাদার আসন-দিতে-না-পারা সত্ত্বেও বিস্ময়করভাবে লক্ষণীয় যে বাংলা ভাষায় এমন কি বাংলাদেশের সাহিত্যেও হাস্যরসের ধারাটি উপেক্ষা করবার মতো ক্ষীণতোয়া নয়।

২.

হাস্যরস ব্যাপারটা কী তা বোঝার আগে আমরা হাসি কেন তা বুঝতে হবে? একজন গোটা মানুষ চেয়ারে বসতে গিয়ে চেয়ার ভেঙে পড়ে গেলে ঘটনাটা আমাদের কাছে কৌতুককর মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছিলেন, মানুষ সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে— এ-কথা সবার জানা; অথচ মোটা মানুষ চেয়ার ভেঙে পড়ে গেলে কারো সুখের কারণ না-ঘটা সত্ত্বেও মানুষ হেসে ওঠে কেন? উত্তরে এর কারণটি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে, 'কৌতুকমাত্রের মধ্যে এমন একটা পদার্থ আছে যাহাতে মানুষের সুখ না হইয়া দুঃখ হওয়া উচিত।' কিন্তু তা হয় না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'যাহা সুসংগত তাহা চিরদিনের নিয়মসম্মত, যাহা অসঙ্গত তাহা ক্ষণকালের নিয়মভঙ্গ। যেখানে যাহা হওয়া উচিত সেখানে তাহা হইলে, তাহাতে আমাদের মনের কোনো উত্তেজনা নাই; হঠাৎ না হইলে কিংবা আর-একরূপ হইলে সেই আকস্মিক অনতিপ্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অনুভব করিয়া সুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।' যে-কারণে আমরা হেসে উঠি তা হচ্ছে *হাস্যভাব*। *হাস্যভাব* যখন *রস*-এ পরিণত হয় তখন তা হয়ে ওঠে *হাস্যরস*। অর্থাৎ বলা যায় যে, ইচ্ছার সঙ্গে অবস্থার অসঙ্গতি নির্দেশই হাস্যরস-এর উপজীব্য। অসঙ্গতিগুলো কোনো কোনো ঘটনা থেকে সৃষ্টি হতে পারে কিংবা সৃষ্টি হতে পারে কোনো চরিত্রকে কেন্দ্র করে। একজন ভীষণ মোটা লোক দ্রুত দৌড়াবার চেষ্টা করলে হাস্যকর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। অথবা বেখাপ্পা দুই মানুষের একত্রে অবস্থান থেকে হাস্যরসের সৃষ্টি হতে পারে। ছেলেমেয়েরা পথে-ঘাটে কুকুর বা ছাগল দেখে। কিন্তু তা দেখে তাদের মনে কোনো হাস্যভাবের উদয় হয় না। কিন্তু যদি হঠাৎ তাদের শ্রেণীকক্ষে একটা কুকুর বা ছাগল ঢুকে পড়তে দেখে তাহলে তাদের মনে হাসির উদ্রেক হয়; অর্থাৎ মোদ্দাকথা হচ্ছে অসঙ্গতি থেকে সৃষ্টি হয় হাসির। অবস্থাগত

কারণে কারো অকস্মাৎ দৈহিক বিকৃতি কিংবা কোনো বিষয়ে অনুভবের ভ্রান্তি হতে পারে হাস্যরসের কারণ।

সুতরাং বলা যায় যে মানুষের জীবনের 'অসঙ্গতি ও বৈষম্যকে এক সর্বগ্রাসী উদার অনুভূতি দ্বারা' গ্রহণ করে লেখকগণ হাস্যরস-এর সাহায্যে 'আপাত বৈষম্যময় মানব-জীবনকেও ক্ষমাসুন্দর হাস্যোজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করেন'। *হাস্যরস* সম্পর্কে আবদুশ শাকুরের ভাষ্য প্রাসঙ্গিক বিধায় উদ্ধৃত করছি; তিনি বলেছেন, 'হাস্যরসমণ্ডিত কথাকারের একটা সাধারণ কৌশলই হল শ্রোতার মনে একটা টেনশানের সৃষ্টি করা, এবং ওটাকে চরম পরিণতিতে না পৌঁছিয়ে মাঝপথে হঠাৎ কোথাও পাংচার করে দেওয়া—অর্থাৎ পাঠকের ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রত্যাশা না-মেটানোর নাটকীয় ছল করা। এমতাবস্থায় পুঞ্জীভূত বাড়তি রবীন্দ্রনাথের কথাও এখানে প্রাণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন *কমেডি* বা *হাস্যরস* হচ্ছে অল্পমাত্রার দুঃখ, দুঃখের মাত্রা যখন বেড়ে যায় তখন সেটা হয়ে যায় *ট্রাজেডি* বা *করুণরস*। এক কথায় দুঃখের মাত্রাভেদই *হাস্যরস* ও *করুণরস*-এর পার্থক্য।

যে-দুঃখের কারণে হাস্যরসের সৃষ্টি তার জন্য যদি সহানুভূতি জাগে 'প্রতিকারহীন দৈন্য-দুর্দশার মধ্যেও লেখক যখন ব্যক্তিগত জীবনের গভীর বেদনাকে জীবনের প্রতি কোনো অভিযোগ বা আক্ষেপহীন ভাবদৃষ্টির সাহায্যে পাঠকের মনে রস-সঞ্চার করে, তখন এই শ্রেণীর হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। লেখকের হাস্যোচ্ছল লঘুতায় তখন বেদনার সকরুণ দীপ্তি রামধনুর সৌন্দর্য সৃষ্টি করে—তাই তাঁহার হাসির পশ্চাতে অশ্রুবিন্দু ঝলমল করিয়া উঠে।'

হাস্যরসে রয়েছে বৈচিত্র্য। এক ধরনের *হাস্যরস* আছে ইংরেজিতে যাকে বলে HUMOUR। HUMOUR হচ্ছে নির্মল হাস্যরস। HUMOUR অন্যকে আঘাত করে সৃষ্টি হয় না, বরং যা অদ্ভুত বা অসঙ্গত তাকে সস্নেহভাবে গ্রহণ করে। এক কথায় HUMOUR-এ আছে 'প্রসন্ন আনন্দ-বোধ বা বেদনা-বিধৌত নির্লিপ্ত হাসির ব্যঞ্জনা'।

আর এক ধরনের হাস্যরস আছে যা সৃষ্টি করতে প্রয়োজন বুদ্ধির দীপ্তি। সূক্ষ্মবুদ্ধি, পাণ্ডিত্য কিংবা চাতুর্যের মাধ্যমে এই হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। ইংরেজিতে এর নাম WIT। দুটি সম্পর্কহীন বিষয়ের মধ্যে একটা আকস্মিক সাদৃশ্য আবিষ্কার করে যখন তা প্রকাশ করা হয় তখন WIT-এর সৃষ্টি হয়। WIT সৃষ্টির জন্য লেখকের থাকতে হয় একাধারে শাণিত বুদ্ধি এবং শব্দ প্রয়োগের নিপুণতা। WIT-এর মাধ্যমে অসঙ্গতির যে-দুঃখকে চিত্রিত করা হয় তা খুবই সূক্ষ্ম এবং দুর্নিরীক্ষ।

হাস্যরস সৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় *ব্যঙ্গ*। *ব্যঙ্গ* মানবজীবনের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে এবং তা নিয়ে রঙ্গ করে। *ব্যঙ্গের* লক্ষ্য হয়ে থাকা নির্বুদ্ধিতার কারণ নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির মাধ্যমে সেই কারণকে সংশোধন করা। *হাস্যরসকে* তাই বলা যায় সশস্ত্র-হাস্যরস। যে-অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে তার সম্পর্কে বিদ্রূপের ছুরি চালিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করার মাধ্যমে সে অন্যায়ের প্রতিকার করা হচ্ছে ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য। একদিক থেকে *ব্যঙ্গকে* আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষুদ্রতা-হীনতা ইত্যাদির কারণে অন্য কাউকে হাস্যাস্পদ করে তোলা মানে তো নিজের অবস্থানকে তার চেয়ে উচ্চস্তরে রয়েছে বলে প্রতীয়মান করা। *ব্যঙ্গের* লক্ষ্যও এই-ই। যে-সব কারণে মানুষ উপহাস্যাস্পদ হয়ে পড়ে প্রায়শই তা দূরীকরণ সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই ব্যঙ্গকারী ক্ষুব্ধ হয়ে আক্রমণ করেন ঐ-সব কারণকে।

একধরনের হাসি আছে যার উদ্ভব ঘটে রঙ্গ বা তামাশার ফলে। এই হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এতে অসঙ্গতির বাড়াবাড়ি একটু বেশিই থাকে। এর একটি দৃষ্টান্ত এমন হতে পারে : ধরা যাক কেউ একজন বিকলাঙ্গ মানুষের মতো তার হাত-পা এবং মুখভঙ্গিকে বিকৃত করে হেঁটে যাচ্ছে। মানুষটির এক ধরনের অসঙ্গতি হাসির উদ্রেক করে। মানের দিক থেকে এ-ধরনের হাস্যরস নিম্নস্তরের। স্থূলতা-ও-গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট বলে রসের আসরে এর মর্যাদা একটু কম।

একই শব্দের বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে কিংবা সম-ধ্বনিবিশিষ্ট কিন্তু ভিন্ন-অর্থবোধক শব্দের প্রয়োগ করে এক ধরনের হাস্যরস সৃষ্টি করা যায়। সংস্কৃত অলঙ্কারিকেরা এর নাম দিয়েছে *যমক* অলঙ্কার; ইংরেজি নাম PUN। এ-ছাড়াও উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, কূটাভাস ইত্যাদি অলঙ্কার প্রয়োগের মাধ্যমেও হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

আবদুশ শাকুর তাঁর *বাংলাসাহিত্যের নির্বাচিত রম্যরচনা ও গল্প* বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় সেরেন কিয়ের্কেগার্দ-এর *কনক্লুডিং আনসায়েন্টিফিক পোস্টস্ক্রিপ্ট*-এর অংশবিশেষ অনুবাদ করে দেখিয়েছেন যে হাস্যরসের শিরেও আছে বিজয়ীর মুকুট : 'করুণরসাত্মক হাস্যরসাত্মক উভয়ের মূলেই রয়েছে মানুষের বৈশিষ্ট্যগত অসঙ্গতি। অসঙ্গতি থেকে বেরুনোর পথ না পেয়ে হতাশায় অবসিত হলেই করুণরসাত্মক সবেদন। প্রতিপক্ষে হাস্যরসাত্মক আবেদন, নিষ্কৃতি পথনির্দেশ সহকারে অসঙ্গতির নগ্নীকরণে আমোদিত বলেই। মানুষের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য এই অন্তর্বিরোধকে করুণরসাত্মক লেখক দেখেন নিয়মিত অমোঘ বিধানরূপে। আর হাস্যরসাত্মক লেখক স্ববিরোধটিকে দেখেন বেখাপ বাস্তবের আরেকটি দৃষ্টান্তরূপে যার সঙ্গে মানবকে তার সাধ্যানুযায়ী জীবনটা যাপনই করে যেতে হবে। এই জীবনবাদিতার বিচারে করুণরসের চেয়ে উচ্চতর স্থান হাস্যরসের। তাই এই রসটিই মানবদেহে প্রাণশক্তির, মানবজীবনে পরমানন্দের এবং মানবজাতির জিজীবিষার প্রতীক'।

অথচ লক্ষণীয় যে হাস্যরসস্রষ্টার সংখ্যা বাংলাভাষার চৌহদ্দিতে ক্রমশ বিরল হয়ে উঠছে। গভীর জীবনবোধকে উদ্ঘাটন করবার পথে হাস্যকৌতুকের সজীবতা যে কোনো রচনাকে কতটা স্নিগ্ধ করে তুলতে পারে তা সাম্প্রতিক অনেক লেখক অনুভব করতে অক্ষম বলেই হাস্যরসের কারবার থেকে তাঁদের অবস্থান এমন যোজন যোজন দূরে। অবশ্য মুষ্টিমেয় যে ক-জন লেখক এই ধারায় এখনও চর্চা অব্যাহত রেখেছেন তাঁদের অনেকেই কৌতুকাস্ত্রের প্রয়োগ করতে গিয়ে এর শক্তির দিগটাকে খুঁজে না পেয়ে তাঁদের রচনাকে স্থূল ও ঐশ্বর্যরিক্ত অবস্থায় নিয়ে ফেলেন। অনেকটা এই ধরনের লেখকদের দ্বারা প্রতারিত হয়েই হাস্যরসবিমুখ হয়ে ওঠেন পাঠকেরা।

হাস্যরসের দিক থেকে এ-কালের শক্তিমান লেখকদের মুখ ফিরিয়ে রাখার আরো একটা প্রধান কারণ আমার মনে হয় তিরিশের আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের নেতৃস্থানীয় বা অভিভাবক-স্থানীয়দের এ-বিষয়ে অনীহা। আধুনিকতাবাদী তিরিশের অভিভাবকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে প্রভাবশালী সেই বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) বা বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) কেউই হাস্যরসের কারবারি ছিলেন না। বুদ্ধদেব বসু এই ধারার প্রতিভূ সুকুমার রায়কে প্রাপ্য সম্মান দিলেও নিজের উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে এর চর্চা করেন নি কিংবা যাঁরা চর্চা করেন নি কিংবা যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁদের

ব্যাপারে খুব একটা মূল্যায়নপ্রয়াসী হন নি, যেমনটি আধুনিকতাবাদী অন্যান্য ধারার সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য হয়েছিলেন। আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বিষ্ণু দে-এর চেতনায় তো হাস্যরস বস্তুটিরই কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আধুনিকতাবাদী ধারার লেখকদের সমকালীন হাস্যরসস্রষ্টা লেখকদের কেউ কেউ পাঠকপ্রিয় হলেও তেমনভাবে মর্যাদা পান নি। তা পেলে পরশুরাম, শিবরাম চক্রবর্তী কিংবা প্রমথনাথ বিশী অথবা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরিদেরকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাংলাভাষার সীমানায় পাওয়া যেত।

৩.

এত হাস্যরসবিমুখতার মধ্যেও একটি মোটামুটি সমৃদ্ধিমান হাস্যরসাত্মক ধারার সাহিত্য যে আমরা পাচ্ছি তার একটা প্রবল উপলক্ষ আমাদের শিশুসাহিত্য। আমাদের কথাসাহিত্যিকদের কেউ কেউ যে এ-ব্যাপারে পারঙ্গম তা-ই জানা যেত না যদি শিশুসাহিত্যের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তাঁরা এই ধারায় সৃষ্টিশীল হতেন। যেমন হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯—), শওকত আলী (১৯৩৬—) বা রাহাত খানের (১৯৩৯—) কথাই ধরা যাক। ছোটগল্প লেখক হিসাবে খ্যাতিমান হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পসাম্রাজ্য ছুড়ে ফেললেও হাস্যরস বস্তুটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ মাত্র যে তিন-চারটি কিশোরপাঠ্য গল্প তিনি লিখেছেন তাতে উপস্থিতি ঘটেছে হাস্যরসের, মাসিক *কচি ও কাঁচা* পত্রিকার চাহিদা মেটাতে গিয়ে *দিলুর গল্প* বইটি না লিখলে রাহাত খানের এই ক্ষমতার কথা বাঙালি পাঠকের পক্ষে হয়তো জানাই সম্ভব ছিল না। শওকত আলীর বেলাতেও এ-কথা প্রযোজ্য।

উদ্ভবলগ্ন থেকেই বাংলা গদ্য হাস্যরসবাহী। মজার ব্যাপার এই যে হাস্যরসবাহিতাকে সম্মানের চোখে দেখা না হলেও বাংলা গদ্যের ঐশ্বর্যশালিতার অনেকটাই হাস্যরস দ্বারা সৃষ্ট। এ-কথা আমরা কালীপ্রসন্ন সিংহ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরীর রচনার দিকে তাকিয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পারি। *রম্যরচনা* অভিধারা যে-ধারার রচনাকে অভিহিত করা হয় সে-ধারার রচনা প্রধানত হাস্যরসবাহিতা, বুদ্ধিদীপ্ততা, প্রসাদগুণসম্পন্নতা এবং সর্বোপরি স্বাদুতায় মণ্ডিত।

বাংলাদেশের সাহিত্যে এই ধারার প্রবীণতম কারবারি হচ্ছে *মফিজন, গোঁফসন্দেশ* খ্যাত মাহবুব উল আলম (১৮৯৮-১৯৯৪)। এরপরই নাম আসে আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৭-১৯৭৯)। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ তাঁর রচনার শক্তিমান দিক। রম্যরচনায় তাঁর সাফল্য সমগ্র বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটেই গুরুত্বের সঙ্গে বিচার্য। *ফুড কনফারেন্স* বা *আয়না* বইয়ে তাঁর প্রতিভা সবচেয়ে উজ্জ্বল। ব্যঙ্গ সৃষ্টিতে তাঁর মৌলিকতা অনস্বীকার্য। আবুল মনসুর আহমদের প্রায় সমসাময়িক কাজী দীন মোহাম্মদ (১৯০৯-১৯৭৫) একসময় রম্যরচনার লেখক হিসাবেই খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর অব্যবহিত অনুজ রম্যরচনার কারবারি আসহাবউদ্দীন আহমদ (১৯১৪-১৯৯৪) অজস্রপ্রসূ না হলেও একেবারে কমও লেখেন নি। নির্মল হাস্যরস সৃষ্টিই তাঁর কলমধারণের একমাত্র কারণ নয়। উন্নত একটা জীবন-ব্যবস্থার প্রত্যাশা করে তিনি কলম চালনা করতেন। বাম ধারার রাজনীতির প্রভাব তাঁর রচনার গভীরে প্রোথিত। কাঙ্ক্ষিতের সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্যকে ব্যঙ্গরসের কষাঘাতে তিনি ফুটিয়ে তুলতেন। হাস্যরসের প্রসাদগুণ শওকত

ওসমানের (১৯১৭—) যে কোনো ধরনের গদ্যরচনারই অন্তঃশীল সম্পদ। রম্যগল্পে কিংবা রম্যপ্রবন্ধে তাঁর সৃষ্টিশীলতা বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। আবুল মনসুর আহমদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও স্বল্পপ্রজ নিভৃতচারী তাজমিলুর রহসান (১৯২৫—) বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রম্যকথার। একান্তভাবে তিনি রম্যরচনারই লেখক। নাট্যকার নূরুল মোমেন (১৯০৬—১৯৮৯) হাস্যরসের প্রসাদগুণ ছড়িয়ে রেখেছেন প্রধানত নাটকের ক্ষেত্রে। তাঁর কয়েকটি রম্যরচনার বইয়ের কথাও প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সাম্প্রতিককালে ছড়ায় হাস্যরস সৃষ্টিতে ব্যস্ত হলেও একদা রম্যকথাসাহিত্যেও আবদার রশীদ (১৯৩০—) ছিলেন সৃষ্টিশীল। রম্যতা মমতাজউদ্‌দীন আহমদের (১৯৩৬—) নাট্যসংলাপের প্রাণ। তাঁর রম্যরচনার প্রাচুর্যও লক্ষণীয়। রম্যরচনায় যেন তিনি পরিপার্শ্বের যাবতীয় অসংগতির প্রতিকার করতে বসেন। রম্যকাহিনী সৃষ্টিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। সাংবাদিক খোন্দকার আলী আশরাফ-এর রম্যরচনায় (১৯৩৬—) সমকালীন সমাজ রাজনীতি ও পরিপার্শ্ব মূর্ত হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল পত্রিকার পাতায় তাঁর সরম্য উপস্থিতি এই ধারাকে উজ্জীবিত রেখেছে। আবদুশ শাকুর (১৯৪১—) বাংলাদেশের সাহিত্যে রম্যরচনার ক্ষেত্রে মননশীলতা ও বৈদগ্ধ্যর পরিচয় রেখে চলেছেন। তাঁর গদ্য যেমন হাস্যরসাত্মক তেমনই প্রসাদগুণসম্পন্ন। তাঁর রম্যরচনা এতটাই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত যে অনেক রচনা শিল্পের উচ্চতর সাফল্যকে স্পর্শ করেছে। জীবনের ছোট ছোট অসংগত ঘটনার মধ্য থেকে তিনি বের করে আনেন হাস্যরসের নির্মল নির্যাস। সাবিহ-উল-আলম (১৯৪০—) রম্য গল্প লিখেছেন কিছু। তিনি আরো কিছুটা অবিরল হলে আমাদের সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা ঋদ্ধ হতো। অকাল প্রয়াত বিপ্লব দাশ (১৯৪৮-১৯৯৭) ছিলেন শক্তিশালী হাস্যরসের কারবারি। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনি ছিলেন কিছুটা শিবরাম চক্রবর্তীর উত্তরসূরী। প্রধানত যমকালঙ্কার এবং অনুপ্রাসের মাধ্যমে তিনি হাস্যরসের সম্ভার সাজাতেন। সমকালীন রাজনীতির ঘটনাবলি নিয়ে রম্যরচনা লিখে হিলাল ফয়েজী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাজনীতির চলমান ঘটনাবলির পর্যবেক্ষক না হলে হিলাল ফয়েজীর রচনার সৌন্দর্য উপভোগ সম্ভব নাও হতে পারে। হানিফ সংকেত (১৯৫৮—) টেলিভিশন অনুষ্ঠানে যেমন সাফল্যে কৌতুক হাস্যের পশরা সাজান তেমনি রম্যনকশা সৃষ্টিতেও তিনি প্রায় একইরকম সার্থক। ব্যঙ্গরসের তীক্ষ্ণতা তাঁর রম্যরচনার শক্তির দিক। নিয়ামত হোসেন (১৯৪০—) প্যারোডি এবং গল্পে হাস্যরস সৃষ্টি করে চলেছেন দীর্ঘকাল ধরে। বিশেষ করে প্যারোডিতে তাঁর সাফল্য সর্বজনস্বীকৃত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রভাবিত তাঁর রম্যগল্পগুলো বাংলাদেশের কিশোর পাঠকদের আনন্দ যোগাচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে। একই ধারায় ইমরুল চৌধুরী (১৯৪২—) একসময় কিশোরপাঠ্য রম্যগল্প রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮—) গল্প-উপন্যাস প্রায়শই স্বতঃস্ফূর্তভাবে রম্যগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। তবে আলাদাভাবে কিছু রম্যগল্প এবং রম্যরচনাও তাঁর কলমে স্ফূর্তি পেয়েছে। লুৎফর রহমান সরকার (১৯৩৪—) রম্যরচনাকার হিসাবে খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁর সুস্মিতস্বভাবী গদ্যের জন্য। অসঙ্গতিকে তিনি কেবল চিহ্নিত করেন, প্রতিকারের প্রত্যাশায় আঘাত নেই তাঁর রচনায়। লুৎফর রহমান রিটন (১৯৬১—) মূলত ছড়ায় হাস্যরস বিতরণ করেন। খুব বেশি গদ্য লেখেন নি। তবে গদ্যেও কৌতুকরস সৃষ্টিতে তিনি মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। তাঁর গদ্যরচনায় কৌতুকরস ছড়িয়ে পড়ে উইট-এর মধ্য দিয়ে।

আনিসুল হক তরুণতম রম্যরসের কারবারি। দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রিকার দাবি মেটাতে তাঁর রচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমকালীনতাকে অতিক্রম করতে পারে না। তা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর গদ্যে কৌতুকের উৎসার ঘটে সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে। রম্যরচনায় আনিসুল হকের কৃতিত্ব তাঁর পরিবেশনার ভিন্নতায়। এই পরিবেশন ভঙ্গিকে তিনি *গদ্যকার্টুন* বা *কথাকার্টুন* নামে অভিহিত করেছেন। অকাল প্রয়াত খান মোহাম্মদ ফারাবী (১৯৫২-১৯৭৪) কিশোর বয়সে হাস্যরসের যে-কটি কিশোরপাঠ্য গল্প লিখেছিলেন সেগুলো খুবই চমকপ্রদ। তিনিও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুসারি।

বাংলাদেশের সাহিত্যের দিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে আমরা বলতে পারব না যে এই ধারা খুবই সমৃদ্ধ। এজন্য প্রতিভাবান লেখকের অভাব যতটা দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী হাস্যরসের চর্চা বা রম্যসাহিত্যের চর্চাকে প্রতিভাবান লেখকদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে বিবেচনা না-করা। আমাদের সাহিত্যিক মহল 'সিরিয়াস' রচনা হিসাবে হাস্যরসাত্মক রচনাকে তেমন একটা মূল্য না-দেওয়ায় এই ধারার চর্চাকে অনেকেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। ফলে সম্ভাবনা থাকলেও ধারাটি যথেষ্ট বিকশিত হয় নি। আশার কথা রচনাগুলো প্রকাশিত হতে শুরু করবে এই আশা দূরাশা নয়।

আহমাদ মাযহার
১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

সূচি

হুযুর কেবলা ১৩

২৫ সের এক আনা মাত্র

৩১ মুষ্টিযুদ্ধ লঘুনৃত্য

৩৮ নামকরণ

৪১ সেকেন্ড হ্যান্ড

৪৪ মশা বাবাজী জিন্দাবাদ

ঘটক চলিল, চলিল ৫১

দাড়ি বিভ্রাট ৫৫

করিবকর্মা ৫৯

ব্যাচেলর ৬৫

আত্মকাহিনী ৭৩

আবুল মনসুর আহমদ [১৮৯৮—১৯৭৯]

হুযুর কেবলা

১

এমদাদ তার সবগুলি বিলাতি ফিন্‌ফিনে ধুতি, সিল্কের জামা পোড়াইয়া ফেলিল ; ফ্লেক্সের ব্রাউন রঙের পাম্প-স্যুগুলি বাবুর্চিখানার বঁটি দিয়া কোপাইয়া ইলশা-কাটা করিল ! চশমা ও রিস্টওয়াচ মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙিয়া ফেলিল ; ক্ষুর, স্ট্রপ, শেভিংস্টিক ও ব্রাশ অনেকখানি রাস্তা হাঁটিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়া আসিল ; বিলাসিতার মস্তকে কঠোর পদাঘাত করিয়া পাথর-বসানো সোনার আংটিটা এক অন্ধ ভিক্ষুককে দান করিয়া এবং টুথক্রিম ও টুথব্রাশ পায়খানার টবের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কয়লা দিয়া দাঁত ঘষিতে লাগিল।

অর্থাৎ এমদাদ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিল ! সে কলেজ ছাড়িয়া দিল।

তারপর সে কোরা খদ্দরের কল্লিদার কোর্তা ও সাদা লুঙি পরিয়া মুখে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ ঝাঁকড়া দাড়ি লইয়া সামনে-পিছনে সমান-করিয়া-চুল-কাটা মাথায় গোল নেকড়ার মতো টুপি কান পর্যন্ত পরিয়া চটিজুতা পায় দিয়া যেদিন বাড়িমুখে রওনা হইল, সেদিন রাস্তার বহুলোক তাকে সালাম দিল।

সে মনে মনে বুঝিল, কলিযুগেও দুনিয়ায় ধর্ম আছে।

কলেজে এমদাদের দর্শনে অনার্স ছিল।

কাজেই সে ধর্ম, খোদা, রসুল কিছুই মানিত না ! সে খোদার আরশ, ফেরেশতা, ওহী, হযরতের মেয়ারাজ লইয়া সর্বদা হাসিঠাট্টা করিত।

কলেজ ম্যাগাজিনে সে মিল, হিউম, স্পেন্সার, কোম্‌তের ভাব চুরি করিয়া অনেকবার খোদার অস্তিত্বের অসারতা প্রমাণ করিয়াছিল। কিন্তু খেলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করিয়া এমদাদ একেবারে বদলাইয়া গেল।

সে ভয়ানক নামায পড়িতে লাগিল। বিশেষ করিয়া নফল নামাযে সে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িল।

গোল-গাল করিয়া বাঁশের কঞ্চি কাটিয়া সে নিজহাতে একছড়া তসবিহ তৈরি করিল। সেই তসবিহ উপর দিয়া অষ্টপ্রহর অঙুলি চালনা করিয়া সে দুইটা আঙুলের মাথা ছিঁড়িয়া ফেলিল।

কিন্তু এমদাদ টলিল না। সে নিজের নধর দেহের দিকে চাহিয়া বলিল : হে দেহ, তুমি আমার আত্মাকে ছোট করিয়া নিজেই বড় হইতে চাহিয়াছিলে ! কিন্তু আর নয়।

সে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তসবিহ চালাইতে লাগিল।

২

দিন যাইতে লাগিল।

ক্রমে এমদাদ একটা অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিল।

বহু চেষ্টা করিয়াও সে এবাদতে আর তেমন নিষ্ঠা আনিতে পারিতেছিল না। নিজেকে বহু শাসাইল, বহু প্রক্রিয়া অবলম্বন করিল ; কিন্তু তথাপি পোড়া ঘুম তাকে তাহাজ্জতের নামায তরক করিতে বাধ্য করিতে লাগিল।

অগত্যা সে নামাযে বসিয়া খোদার নিকট হাত তুলিয়া কাঁদিবার বহু চেষ্টা করিল। চোখের পানির অপেক্ষায় আগে হইতে কান্নার মতো মুখ বিকৃত করিয়া রাখিল। কিন্তু পোড়া চোখের পানি কোনো মতেই আসিল না।

সে স্থানীয় কংগ্রেস ও খেলাফৎ কমিটির সেক্রেটারি ছিল।

সেখানে প্রত্যহ সকালে-বিকালে চারিপাশের বহু মওলানা মওলবী সমবেত হইয়া কাবুলের আমিরের ভারতাক্রমণের কতদিন বাকি আছে তার হিসাব করিতেন এবং খেলাফৎ নোট-বিক্রয়-লব্ধ পয়সায় প্রত্যহ পান ও যর্‌দা এবং সময়-সময় নাশতা খাইতেন।

ইহাদের একজনের সুফী বলিয়া খ্যাতি ছিল। তিনি এক পীরসাহেবের স্থানীয় খলিফা ছিলেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত 'এল্ হু' 'এল্ হু' করিতেন।

অল্পদিন পূর্বে 'এসতেখারা' করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন যে, চারি বৎসরের মধ্যে কাবুলের আমির হিন্দুস্থান দখল করিবেন।

তাঁহার কথায় সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল ; কারণ মেয়েলোকের উপর জিনের আসর হইলে তিনি জিন ছাড়াইতে পারিতেন।

এই সুফী সাহেবের নিকট এমদাদ তার প্রাণের বেদনা জানাইল।

সুফী সাহেব দাড়িতে হাত বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া ইংরাজি-শিক্ষিতদের উদ্দেশ করিয়া অনেক বাঁকা-বাঁকা কথা বলিয়া উপসংহারে বলিলেন : হকিকতান যদি আপনি রুহের তরক্কি হাসেল করিতে চান, তবে আপনাকে আমার কথা রাখিতে হইবে। আচ্ছা, মাস্টার সাহেব, আপনি কার মুরিদ?

এমদাদ অপ্রতিভভাবে বলিল : আমি তো কারো মুরিদ হই নাই।

সুফী সাহেব যেন রোগনির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন এইভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন : হ্-ম্, তাই বলুন। গোড়াতেই গলৎ। পীর না ধরিয়া কি কেহ রুহনিয়ৎ হাসেল করিতে পারে? হাদিস শরিফে আসিয়াছে : (এইখানে সুফী সাহেব বিশুদ্ধরূপে আইন-গাইনের উচ্চারণ করিয়া কিছু আরবি আবৃত্তি করিলেন এবং উর্দুতে তার মানে-মতলব বয়ান ধরিয়া অবশেষে বাঙলায় বলিলেন) : জযবা ও সলুক খতম করিয়া ফানা ও বাকা লাভে সমর্থ হইয়াছেন এইরূপ কামেল ও মোকাম্মেল, সালেক ও মজযুব পীরের দামন না করিয়া কেহ যমিরের রওশনি ও রুহের তরক্কি হাসেল করিতে পারে না।

হাদিসের এই সুস্পষ্ট নির্দেশের কথা শুনিয়া এমদাদ নিতান্ত ঘাবড়াইয়া গেল।

সে ধরা-গলায় বলিল : কী হইবে আমার তাহা হইলে সুফী সাহেব?

সুফী সাহেব এমদাদের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন : ঘাবড়াইবার কোনো কারণ নাই। কামেল পীরের কাছে গেলে একদিনে তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।

স্বস্তিতে এমদাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে আগ্রহাতিশয্যে সুফী সাহেবের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল : কোথায় পাইব কামেল পীর? আপনার সন্ধানে আছে?

উত্তরে সুফী সাহেব সুর করিয়া একটি ফারসি বয়েত আবৃত্তি করিয়া তার অর্থ বলিলেন : জওহরের তালাশে যারা জীবন কাটাইয়াছে, তারা ব্যতীত আর কে জওহরের খবর দিতে পারে? হাযার শোকর খোদার দরগায়, বহু তালাশের পর তিনি জওহর মিলাইয়াছেন।

সুফী সাহেবের হাত তখনো এমদাদের মুঠার মধ্যে ছিল। সে তা আরো জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল : আমাকে লইয়া যাইবেন না সেখানে?

সুফী সাহেব বলিলেন : কেন লইয়া যাইব না? হাদিস শরিফে আসিয়াছে : (আরবি ও উর্দু) যে ব্যক্তি আল্লার রাস্তায় আসিতে চায়, তার সাহায্য কর।

সংসারে একমাত্র বন্ধন এবং অভিভাবক বৃদ্ধা ফুপুকে কাঁদাইয়া একদিন এমদাদ সুফী সাহেবের সঙ্গে পীর-যিয়ারতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

এমদাদ দেখিল : পীর সাহেবের একতালা পাকা বাড়ি। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অন্দরবাড়ির সব ক'খানা ঘর পাকা হইলেও বৈঠকখানাটি অতি পরিপাটি প্রকাণ্ড খড়ের আটচালা।

সে সুফী সাহেবের পিছনে পিছনে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। দেখিল : ঘরে বহু লোক জানু পাতিয়া বসিয়া আছেন। বৈঠকখানার মাঝখানে দেওয়াল ঘেঁষিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসনে মেহেদি-রঞ্জিত দাড়িবিশিষ্ট একজন বৃদ্ধলোক তাকিয়া হেলান দিয়া আলবোলায় তামাক টানিতেছেন।

এমদাদ বুঝিল : ইনিই পীর সাহেব।

'আসসালামু আলায়কুম' বলিয়া সুফী সাহেব সোজা পীর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া হাঁটু পাতিয়া বসিলেন। পীর সাহেব সম্মুখস্থ তাকিয়ার উপর একটি পা তুলিয়া দিলেন। সুফী সাহেব সেই পায়ে হাত ঘষিয়া নিজের চোখ-মুখ ও বুকে লাগাইলেন।

তৎপর পীর সাহেব তাঁর হাত বাড়াইয়া দিলেন। সুফী সাহেব তা চুম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং পিছাইয়া-পিছাইয়া কিছুদূর গিয়া অন্যান্য সকলের ন্যায় জানু পাতিয়া বসিলেন।

পীর সাহেব এতক্ষণে কথা বলিলেন : কি রে বেটা, খবর কী? তুই কি এরই মধ্যে দায়েরায়ে হকিকতে মহব্বত ও জযবায়ে-যাতী-বনাম হোব্বেব এশ্‌ক্ হাসেল করিয়া ফেলিলি নাকি?

পীর সাহেবের এই ঠাট্টায় লজ্জা পাইয়া সুফী সাহেব মাথা নিচু করিয়া মাজা ঈষৎ উঁচু করিয়া বলিলেন : হযরত, বান্দাকে লজ্জা দিতেছেন!

পীর সাহেব তেমনি হাসিয়া বলিলেন : তা না হইলে নিজের চিন্তা ছাড়িয়া অপরের রুহের সুপারিশ করিতে আমার নিকট আসিল কেন? কই, তোর সঙ্গী কোথায়? আহা! বেচারা বড়ই অশান্তিতে দিনপাত করিতেছে!

এই বলিয়া পীরসাহেব চক্ষু বুজিলেন এবং প্রায় একমিনিট কাল ধ্যানস্থ থাকিয়া চক্ষু মেলিয়া বলিলেন : সে এই ঘরেই হাযের আছে দেখিতেছি।

উপস্থিত মুরিদগণের সকলে বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

এমদাদ ভক্তি ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে পীর সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মেহেদি-রঞ্জিত দাড়ি-গোঁফের ভিতর দিয়া পীর সাহেবের মুখ হইতে একপ্রকার জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

সুফী সাহেব এমদাদকে আগাইয়া আসিতে ইশারা করিলেন। সে ধীরে ধীরে পীর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুফী সাহেবের ইঙ্গিতে অনভ্যস্ত হাতে কদমবুসি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পীর সাহেব 'বস বেটা, তোর ভালো হইবে। আহা, বড় গরিব !' বলিয়া আলবোলার নলে দম কষিলেন।

সুফী সাহেব আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন : হযরত, এর অবস্থা তত গরিব নয়। বেশ ভালো তালুক সম্পত্তি—

পীর সাহেব নলে লম্বা টান কষিয়াছিলেন ; কিন্তু মধ্যপথে দম ছাড়িয়া দিয়া মুখে ধোঁয়া লইয়াই বলিলেন : বেটা, তোরা আজিও দুনিয়ার ধন-দওলত দিয়া ধনী-গরিব বিচার করিস। এটা তোদের বুঝিবার ভুল। আমি গরিব কথায় দুনিয়াবি গোরবৎ বুঝাই নাই। মুসলমানদের জন্য দুনিয়ার ধন-দওলত হারাম। এই ধন-দওলত এনসানের রুহানিয়ত হাসেলে বাধা জন্মায়, তার মধ্যে নফসানিয়ত পয়দা করে। আল্লাহতালা বলিয়াছেন : (আরবি ও উর্দু) বেশক দুনিয়ার ধন-দওলত শয়তানের ওয়াস ওয়াসা, ইহা হইতে দূরে পলায়ন কর। কিন্তু দুনিয়ার মায়া কাটান কি সহজ কথা? তোদের আমি দোষ দিই না। তোদের অনেকেই এখনো যেকেরের দরজাতেই পড়িয়া আছিস। সেকরে জলি ও জেকরে-খফি—এই দুই দরজার যেকের সারিয়া পরে ফেকেরের দরজায় পঁহুছিতে হয়। ফেকের হইতে যহুর এবং যহুর হইতে মোরাকেবা-মোশাহেদার কাবেলিয়ত হাসেল হয়। খোদার ফযলে আমি আরেফিন, সালেহীন ও সিদ্দিকিনের মোকামাতের বিভিন্ন দায়েরার ভিতর দিয়া যেভাবে এলমে-লাদুন্নির ফয়েয হাসেল করিয়াছি, তোদের কল্‌ব অতটা কুশাদা হইতে অনেক দেরি —অনেক—

—বলিয়া তিনি হুক্কার নলটা ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং চোখ বুজিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিলেন : কুদরতে-ইযদানি, কুদরতে-ইযদানি।

মুরিদরা সব সে-চিৎকারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।

পীর সাহেব চিৎকার করিয়াই আবার চোখ বুজিয়াছিলেন। তিনি এবার ঈষৎ হাসিয়া চোখ মেলিয়া বলিলেন : আমরা কত বৎসর হইল এখানে বসিয়া আছি?

জনৈক মুরিদ বলিলেন : হযরত, বৎসর কোথায়? এই-না কয়েক ঘন্টা হইল।

পীর সাহেব হাসিলেন। বলিলেন : অনেক দেরি—অনেক দেরি। আহা, বেচারারা চোখের বাহিরে আর কিছুই দেখিতে পায় না।

অপর মুরিদ বলিলেন : হুযুর কেবলা, আপনার কথা মোটেই বুঝিতে পারিলাম না।

পীর সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন : অত সহজে কি আর সব কথা বুঝা যায় রে বেটা? চেষ্টা কর, চেষ্টা কর।

মুরিদটি ছিলেন একটু আবদেরে রকমের। তিনি বায়না ধরিলেন : না কেবলা, আমাদিগকে বলিতেই হইবে। কেন আপনি বৎসরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন?

পীর সাহেব বলিলেন : ও-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিস না। তার চেয়ে অন্য কথা শোন্। এই যে সাদুল্লাহ (সুফী সাহেবের নাম) একটি ছেলেকে আমার নিকট মুরিদ করিতে লইয়া আসিল, আমি সে-কথা কী করিয়া জানিতে পারিলাম? আজ তোমরা তাজ্জব হইতেছ। কিন্তু ইনশাআল্লাহ, যখন তোমরা মোরাকেবায়ে-নেসবতে-বায়ন্নাসে তালিম লইবে, তখন অপরের নেসবত সম্বন্ধে তোমাদের কলব আয়নার মতো রওশন হইয়া যাইবে। আলগরয ইহাও খোদার এক শানে-আযিম। সাদুল্লাহ যখন আমার দস্ত-বুসি করে, তখন তার মুখের দিকে আমার নযর পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার রুহ সাদুল্লার রুহের দিকে মোতাওয়াজ্জাহ হইয়া গেল। সেখানে আমি দেখিলাম, সাদুল্লার রুহ আর একটা নূতন রুহের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। উহাতেই আমি সব বুঝিয়া লইলাম। আল্লাহু আযিমুশশান।

বলিয়া পীর সাহেব একজন মুরিদকে হুক্কার দিকে ইঙ্গিত করিলেন।

মুরিদ হুক্কার মাথা হইতে চিলিম লইয়া তামাক সাজিতে বাহির হইয়া গেল।

পীর সাহেব বলিলেন : তোরা আমার নিজের নুৎফার ছেলের মতো। তথাপি তোদের নিকট হইতে আমাকে অনেক গায়েবের কথা গোপন রাখিতে হয়। কারণ তোরা সে-সমস্ত বাতেনি কথা বরদাশ্‌ত করিতে পারিবি না। যেকের ও ফেকের দ্বারা কলব কুশাদা করিবার আগেই কোনও বড় রকমের নূরে তজল্লি তাতে ঢালিয়া দিলে তাতে কলব অনেক সময় ফাটিয়া যায়। এলমে-লাদুন্নি হাসেল করিবার আগেই আমি একবার লওহে-মহফুযে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন আমি মাত্র দায়েরায়ে-হকিকতে-লাতাআইউনে তালিম লইতেছিলাম। সায়েরে-না যাবির ফয়েয তখনো আমার হাসেল হয় নাই। কাজেই আরশে-মওয়াল্লার পরদা আমার চোখের সামনে হইতে উঠিয়া যাইতেই আমি নূরে-ইযদানি দেখিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িলাম। তারপর আমার জেস্‌মের মধ্যে আমার রুহের সন্ধান না-পাইয়া আমার মুর্শেদ-কেবলা—তোরা তো জানিস আমার ওয়ালেদ সাহেবই আমার মুর্শেদ—লওহে মহফুয হইতে আমার রুহ আনিয়া আমার জেসমের মধ্যে ভরিয়া দেন, এবং নিজের দায়রার বাহিরে যাওয়ার জন্য আমাকে বহুৎ তম্বিহ করেন। কাজেই দেখিতেছিস, কাবেলিয়ত হাসেল না করিয়া কোনও কাজে হাত দিতে নাই। খানিকক্ষণ আগে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম : আমরা কত বৎসর যাবৎ এখানে বসিয়া আছি? শুনিয়া তোরা অবাক হইয়াছিলি। কিন্তু এর মধ্যে যে-ঘটনা ঘটিয়াছে, তা শুনিলে তো আরো তাজ্জব হইয়া যাইবি। সে জন্যই সে-কথা বলিতে চাই নাই। কিন্তু কিছু কিছু না বলিলে তোরা শিখবি কোথা হইতে? তাই সে-কথা বলাই উচিত মনে করিতেছি। সাদুল্লাহ এখানে আসিবার পর আমি আমার রুহকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। সে তামাম দুনিয়া ঘুরিয়া সাত হাযার বৎসর কাটাইয়া তারপর আমার জেস্‌মে পুনরায় প্রবেশ করিয়াছে। এই সাত হাযার বৎসরে কত বাদশাহ ওফাত করিয়াছে, কত সুলতানাৎ মেস্‌মার হইয়াছে, কত লড়াই হইয়াছে ; সব আমার সাফ-সাফ মনে আছে। সেরেফ এইটুকুই বলিলাম; ইহার বেশি শুনিলে তোদের কলব ফাটিয়া যাইবে।

ইতিমধ্যে তামাক আসিয়াছিল।

পীর সাহেব নল হাতে লইয়া ধীরে-ধীরে টানিতে লাগিলেন।

সভা নিস্তব্ধ রহিল। কলব ফাটিয়া যাইবার ভয়ে কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

এমদাদ পীর সাহেবের কথা কান পাতিয়া শুনিতেছিল। কৌতূহল ও বিস্ময়ে সে অস্থিরতা বোধ করিতে লাগিল।

সে স্থির করিল, ইহার মুরিদ হইবে।

৪

পীর সাহেব অনেক নিষেধ করিলেন। বলিলেন : বাবা, সংসার ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না; তাসাউওয়াফ বড় কঠিন জিনিস ইত্যাদি।

কিন্তু এমদাদ তাওয়াজ্জোহ্ লইল।

পীর সাহেব নিজের লতিফায় যেকের জারি করিয়া সেই যেকের এমদাদের লতিফায় নিক্ষেপ করিলেন।

এমদাদ প্রথম লতিফা জেকরে-জলি আরম্ভ করিল।

সে দিবানিশি দুইচোখ বুজিয়া পীর সাহেবের নির্দেশমতো 'এল্ হু' 'এল্ হু' করিতে লাগিল।

পীর সাহেব বলিয়াছিলেন : খেলওয়াৎ-দর-আঞ্জুমান দ্বারা নিজের কলবকে স্বীয় লতিফার দিকে মুতাওয়াজ্জাহ করিতে পারিলে তার কলবে যাতে-আহাদিয়তের ফয়েয হাসেল হইবে এবং তার রুহ ঘড়ির কাঁটার ন্যায় কাঁপিতে থাকিবে।

কিন্তু এমদাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও তার কলবকে লতিফায় মুতাওয়াজ্জাহ করিতে পারিল না। তৎপরিবর্তে তার চোখের সামনে পীর সাহেবের মেহেদি-রঞ্জিত দাড়ি ও তাঁর রুপা-বাঁধানো গড়গড়ার ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

ফলে তার কলবে যাতে-আহাদিয়তের ফয়েয হাসেল হইয়া তার রুহকে ঘড়ির কাঁটার মতো কাঁপাইবার পরিবর্তে ফুপু-আম্মার স্মৃতি বাড়ি যাইবার জন্য তার মনকে উচাটন করিয়া তুলিতে লাগিল।

দিন যাইতে লাগিল।

অনাহারে ও অনিদ্রায় এমদাদের চোখ দুটি মস্তকের মধ্যে প্রবেশ করিল। তার শরীর নিতান্ত দুর্বল ও মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল।

সে বুঝিল : এইভাবে আরও কিছুদিন গেলে তার রুহ বস্তুতই জেসম হইতে আযাদ হইয়া আলমে-আমরে চলিয়া যাইবে।

সে স্থির করিল : পীর সাহেবের কাছে নিজের অক্ষমতার কথা নিবেদন করিয়া সে একদিন বিদায় হইবে।

কিন্তু বলি-বলি করিয়াও কথাটা বলিতে পারিল না।

একটা নূতন ঘটনায় সে বিদায়ের কথাটা আপাতত চাপিয়া গেল।

দূরবর্তী একস্থানে মুরিদগণ পীর সাহেবকে দাওয়াত করিল।

প্রকাণ্ড বজরায় একমণ ঘি, আড়াইমণ তেল, দশমণ সরু চাউল, তিনশত মুরগি, সাত সের আম্বুরি তামাক এবং তেরজন শাগরেদ লইয়া পীর সাহেব 'মুরিদানে' রওনা হইলেন।

পীর সাহেবের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইংরাজিতে লিখিয়া কলিকাতায় সংবাদপত্রে পাঠাইবার জন্য এমদাদকেও সঙ্গে লওয়া হইল। নদীর সৌন্দর্য, নদী-পারের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এমদাদের কাছে বেশ লাগিল।

পীর সাহেব গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলেন।

তিনি মুরিদগণের নিকট যে-অভ্যর্থনা পাইলেন, তাহা দেখিলে অনেক রাজা-বাদশাহ রাজত্ব ছাড়িয়া মোরাকেবা-মোশাহেদায় বসিতেন।

পীর সাহেব গ্রামের মোড়লের বাড়িতে আস্তানা করিলেন।

বিভিন্ন দিন বিভিন্ন মুরিদের বাড়িতে বিরাট বিরাট ভোজ চলিতে লাগিল।

পীর সাহেবের একটু দূরে বসিয়া গুরুভোজন করিয়া এমদাদ এতদিনের কৃচ্ছ্রসাধনার প্রতিশোধ লইতে লাগিল। ইহাতে প্রথম-প্রথম তার একটু পেটের পীড়া দেখা দিলেও শীঘ্রই সে সামলাইয়া উঠিল এবং তার শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও চেহারা বেশ চিকনাই হইয়া উঠিতে লাগিল।

পীর সাহেবের ভাত ভাঙিবার কসরত দেখার সুযোগ ইতিপূর্বে এমদাদের হয় নাই। এইবার সেই ভাগ্যলাভ করিয়া এমদাদ বুঝিল : পীর সাহেবের রুহানি শক্তি যত বেশিই থাকুক-না কেন, তাঁর হযমশক্তি নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি।

সন্ধ্যায় পুরুষদের জন্য মজলিস বসিত।

রাত্রে এশার নামাযের পর অন্দরমহলে মেয়েদের জন্য ওয়ায হইত। কারণ অন্য সময় মেয়েদের কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়।

সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল।

স্ত্রীলোকদিগকে ধর্মকথা বুঝাইতে একটু দেরি হইত। কারণ মেয়েলোকের বুদ্ধিশুদ্ধি বড় কম—তারা নাকেস-আকেল।

কিন্তু বাড়িওয়ালার ছেলে রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমন সম্বন্ধে পীর সাহেবের ধারণা ছিল অন্য রকম। মেয়ে-মজলিসে ওয়ায করিবার সময় তিনি ইহারই দিকে ঘন-ঘন দৃষ্টিপাত করিতেন।

তিনি অনেক সময় বলিতেন : তাসাউওয়াফের বাতেনি কথা বুঝিবার ক্ষমতা এই মেয়েটার মধ্যেই কিছু আছে। ভালো করিয়া তাওয়াজ্জোহ দিলে তাকে আবেদা রাবেয়ার দরজায় পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এশার নামাযের পর দাড়িতে চিরুনি ও কাপড়ে আতর লাগান সুন্নত এবং পীর সাহেব সুন্নতের একজন বড় মো'তেকাদ ছিলেন।

ওয়ায করিবার সময় পীর সাহেবের প্রায়ই জযবা আসিত।

সে জযবাকে মুরিদগণ 'ফানাফিল্লাহ' বলিত।

এই 'ফানাফিল্লা'র সময় পীর সাহেব 'জ্বলিয়া গেলাম' 'পুড়িয়া গেলাম' বলিয়া চিৎকার করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িতেন।

এই সময় পীর সাহেবের রুহ আলমে-খালক হইতে আলমে-আমরে পৌঁছিয়া রুহে ইযদানির সঙ্গে ফানা হইয়া যাইত এবং নূরে ইযদানি তাঁর চোখের উপর আসিয়া পড়িত। কিন্তু সে নূরের জলওয়া পীর সাহেবের চক্ষে সহ্য হইত না বলিয়া তিনি এইরূপ চিৎকার করিতেন।

তাই জযবার সময় একখণ্ড কালো মখমল দিয়া পীর সাহেবের চোখ-মুখ ঢাকিয়া দিয়া তাঁর হাত-পা টিপিয়া দিবার ওসিয়ত ছিল।

এইরূপ জযবা পীর সাহেবের প্রায়ই হইত।

—এবং মেয়েদের সামনে ওয়ায করিবার সময়েই একটু বেশি হইত।

এই সব ব্যাপারে এমদাদের মনে একটু খটকার সৃষ্টি হইল।

কিন্তু সে জোর করিয়া মনকে ভক্তিমান রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সে চেষ্টায় সফল হইবার আগেই কিন্তু ও-পথে বাধা পড়িল। প্রধান খলিফা সুফী বদরদ্দীন সাহেবের সঙ্গে পীর সাহেবকে প্রায়ই কানাকানি করিতে দেখিয়া এমদাদের মনে খটকা বাড়িয়া গেল। তার মনে পীর সাহেবের প্রতি একটা দুর্নিবার সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

এমন সময় পীর সাহেব অত্যন্ত অকস্মাৎ একদিন ঘোষণা করিলেন : তিনি আর দু-এক দিনের বেশি সে অঞ্চলে তশরিফ রাখিবেন না।

এই গভীর শোক সংবাদে শাগরেদ-মুরিদগণের সকলেই নিতান্ত গমগিন হইয়া পড়িল।

জনৈক শাগরেদ সুফী সাহেবের ইশারায় বলিলেন : হুযুর কেবলা, আপনি একদিন বলেছিলেন, এবার এ-অঞ্চলে মুরিদগণকে কেরামতে-নেসবতে-বায়নান্নাস দেখাইবেন। তা না দেখাইয়াই কি হুযুর এখান হইতে তশরিফ লইয়া যাইবেন? এখানকার মুরিদগণের অনেকেই বলিতেছেন : হুযুর মাঝে-মাঝে কেরামত দেখান না বলিয়া উম্মী মুরিদগণের অনেকেই গোমরাহ হইয়া যাইতেছে। মওলানা লকবধারী ঐ ভণ্ডটা ও-পাড়ার অনেক মুরিদকে ভাগাইয়া নিতেছে ; সে নাকি বৎসর-বৎসর একবার আসিয়া কেরামত দেখাইয়া যায়।

পীর সাহেব গম্ভীরমুখে বলিলেন : (আরবি ও উর্দু) আল্লাই কেরামতের একমাত্র মালেক, মানুষের সাধ্য কি কেরামত দেখায়? ও-সব শয়তানের চেলাদের কথা আমার সামনে বলিও না। তবে হ্যাঁ, মোরাকেবায়ে-নেসবতে-বায়নান্নাস-এর তরকিব দেখাইব বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তার আর সময় কোথায়?

সমস্ত শাগরেদ ও মুরিদগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন : না হুযুর, সময় করিতেই হইবে, এবার উহা না-দেখিয়া ছাড়িব না।

অগত্যা পীর সাহেব রাজি হইলেন।

স্থির হইল, সেই রাত্রেই মোরাকেবা বসিবে।

সারাদিন আয়োজন চলিল।

রাত্রে মৌলুদের মহফেল বসিল। হযরত পয়গম্বর সাহেবের অনেক-অনেক মোওয়াজেযাত বর্ণিত হইল।

মৌলুদ শেষে খাওয়া-দাওয়া হইল এবং তৎপর মোরাকেবার বৈঠক বসিল।

৫

পীর সাহেব বলিলেন : আজ তোমাদের আমি যে মোরাকেবার তরকিব দেখাইব, ইহা দ্বারা আমরা যে-কোনও লোকের রুহের সঙ্গে কথা বলিতে পারি। আমি যদি নিজে মোরাকেবায় বসি, তবে সেই রুহ গোপনে আমার সঙ্গে কথা বলিয়া চলিয়া যাইবে। তোমরা কিছুই দেখিতে পাইবে না। তোমাদের মধ্যে একজন মোরাকেবায় বস, আমি তার রুহের দিকে তোমরা যার কথা বলিবে তার রুহের তাওয়াজ্জোহ দেলাইয়া তারই রুহের ফয়েয হাসেল করিব। তৎপর তোমরা যে-কেহ তার সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে। তোমাদের মধ্যে কে মোরাকেবায় বসিবে?

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

কেহই কোনো কথা বলিল না, মোরাকেবায় বসিতে কেহই অগ্রসর হইল না।

এমদাদ দাঁড়াইয়া বলিল : আমি বসিব।

পীর সাহেব একটু হাসিলেন। বলিলেন : বাবা, মোরাকেবা অত সোজা নয়। তুই আজিও যেকরে-খফা-আম করিস নাই, মোরাকেবায় বসিতে চাস?

—বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

দেখাদেখি উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল।

লজ্জায় এমদাদের রাগ হইল। সে বসিয়া পড়িল।

পীর সাহেব আবার বলিলেন : কি, মুরিদগণের মধ্যে আজিও কারও এতদূর রুহানি তরক্কি হাসেল হয় নাই, যে মোরাকেবায় বসিতে পারে? আমার খলিফাদের মধ্যেও কেহ নাই?

—বলিয়া তিনি শাগরেদদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

প্রধান খলিফা সুফী সাহেব উঠিয়া বলিলেন : হুযুর কেবলা কি তবে বান্দাকেই হুকুম করিতেছেন? আমি তো আপনার আদেশে কতবার মোরাকেবায়-নেসবতে-বায়নান্নাসে বসিয়াছি। কোনও নূতন লোককে বসাইলে হইত না?

সুফী সাহেব আরও অনেকবার বসিয়াছেন শুনিয়া মুরিদগণের অন্তরে একটু সাহসের উদ্রেক হইল।

তারা সকলে সমস্বরে বলিল : আপনিই বসুন, আপনিই বসুন।

অগত্যা পীর সাহেবের আদেশে সুফী সাহেব মোরাকেবায় বসিলেন।

পীর সাহেব উপস্থিত দর্শকদের দিকে চাহিয়া বলিলেন : কার রুহের ফয়েয হাসেল করিব?

মুরিদগণের মুখে কথা জোগাইবার আগেই জনৈক শাগরেদ বলিলেন : এইমাত্র মৌলুদ-শরিফ হইয়াছে; হযরত পয়গম্বর সাহেবের মোয়াজেযা বয়ান হইয়াছে। তাঁরই রুহ আনা হোক।

সকলেই খুশি হইয়া বলিল : তাই হউক, তাই হউক।

তাই হইল।

সুফী সাহেব আতর-সিক্ত মখমলের গালিচায় তাকিয়া হেলান দিয়া বসিলেন। চারিদিকে আগরবাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। মেশক-যাফরান ও আতরের গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল।

পীর সাহেব তাঁর প্রধান খলিফার রুহে শেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদের রুহ-মোবারক নাযেল করিবার জন্য ঠিক তাঁর সামনে বসিলেন।

শাগরেদরা চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া মিলিত-কণ্ঠে সুর করিয়া দরুদ পাঠ করিতে লাগিলেন। পীর সাহেব কখনো জোরে, কখনো-বা আস্তে নানা প্রকার দোওয়া-কালাম পড়িয়া সুফী সাহেবের চোখে-মুখে ফুঁকিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ ফুঁকিবার পর শাগরেদগণকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া পীর সাহেব বুকে হাত বাঁধিয়া একদৃষ্টে সুফী সাহেবের বুকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুফী সাহেবের বুকের দুইটা বোতাম খুলিয়া তাঁর বুকের খানিকটা অংশ ফাঁক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পীর সাহেব তাঁর দৃষ্টি সেইখানেই নিবদ্ধ করিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সুফী সাহেবের শরীর কাঁপিতে লাগিল। কম্পন ক্রমেই বাড়িয়া গেল। সুফী সাহেব ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং হাত-পা ছুড়িতে-ছুড়িতে মূর্ছিতের ন্যায় বিছানায় লুটাইয়া পড়িলেন।

পীর সাহেব মুরিদগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন : বদর বাবাজির তকলিফ হইল। কী করিব? পরের রুহের উপর অন্য রুহের হাসেল আসানির সঙ্গে করা বেলকুল না-মোমকেন। যা' হউক, হযরতের রুহ তশরিফ আনিয়াছেন।

তোমরা সকলে উঠিয়া কেয়াম কর।

—বলিয়া তিনি স্বয়ং উঠিয়া পড়িলেন। সকলেই দাঁড়াইয়া সমস্বরে পড়িতে লাগিল : ইয়া নবী সালাম আলায় কা ইত্যাদি।

কেয়াম ও দরুদ শেষ হইলে অভ্যাসমতো অনেকেই বসিয়া পড়িল।

পীর সাহেব ধমক দিয়া বলিলেন : হযরতের রুহে পাক এখনো এই মজলিসে হাযের আছেন, তোমরা কেহ বসিতে পারিবে না। কার কী সওয়াল করিবার আছে, করিতে পার।

এমদাদ একটা বিষম ধাঁধায় পড়িয়া গেল। সে ইহাকে কিছুতেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না।

—মাথায় এক ফন্দি আঁটিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল : কেবলা, আমি কোনো সওয়াল করিতে পারি?

পীর সাহেব চোখ গরম করিয়া বলিলেন : যা না, জিজ্ঞাস কর না গিয়া!

—বলিয়া কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত মোলায়েম করিয়া আবার বলিলেন : বাবা সকলের কথাই যদি রুহে-পাকের কাছে পঁহুছিত, তবে দুনিয়ার সব মানুষই ওলি-আল্লাহ হইয়া যাইত।

এমদাদ তথাপি সুফী সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল : আপনি যদি হযরত পয়গম্বর সাহেবের রুহ হন, তবে আমার দরুদ-সালাম জানিবেন।

হযরতের রুহ কোনো জবাব দিল না।

পীর সাহেব এমদাদের কাঁধে হাত দিয়া তাকে একদিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন : অধিকক্ষণ রুহে পাককে রাখা বে-আদবি হইবে। তোমাদের যদি কাহারও সিনা সাফ হইয়া থাকে, তবে আসিয়া যে-কোনো সওয়াল করিতে পার।

—বলিতেই পীর সাহেবের অন্যতম খলিফা মওলানা বেলায়েতপুরী সাহেব অগ্রসর হইয়া 'আস্সালামো আলায়কুম ইয়া রসুলুল্লাহ' বলিয়া সুফী সাহেবের সামনে দাঁড়াইলেন।

সকলে বিস্মিত হইয়া শুনিল সুফী সাহেবের মুখ দিয়া বাহির হইল : ওয়া আলায়কুমুস্ সালাম, ইয়া উম্মতি।

মওলানা সাহেব বলিলেন : হে রেসালত-পানা, সৈয়দুল কাওনায়েন, আমি আপনার খেদমতে একটা আরয করিতে চাই।

আওয়ায হইল : শিগগির বল, আমার আর দেরি করিবার উপায় নাই।

মওলানা : আমাদের পীর দস্তগির কেবলা সাহেব নূরে-ইযদানির জলওয়া সহ্য করিতে পারেন না, ইহার কারণ কী? তাঁর আমলে কি কোনও গলৎ আছে?

কঠোর সুরে উত্তর হইল : হ্যাঁ, আছে।

পীর সাহেব শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি কাঁদ-কাঁদ সুরে নিজেই বলিলেন : কী গলৎ আছে, ইয়া রসুলুল্লাহ? আমার পঞ্চাশ বৎসরের রঞ্জ-কশি কি তবে সব পণ্ড হইয়াছে?

—বলিয়া পীর সাহেব কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সুফী সাহেবের অচেতন দেহের মধ্য হইতে আওয়াজ হইল : হে আমার পিয়ারা উম্মৎ, ঘাবড়াইও না। তোমার উপর আল্লার রহমৎ হইবে। তুমি মারফৎ খুঁজিতেছ। কিন্তু শরিয়ত ত্যাগ করিয়া কি মারফত হয়?

পীর সাহেব হাত কচলাইয়া বলিলেন : হুযুর, আমি কবে শরিয়ত অবহেলা করিলাম?

উত্তর হইল : অবহেলা কর নাই, কিন্তু পালনও কর নাই। আমি শরিয়তে চার বিবি হালাল করিয়াছি। কিন্তু তোমার মাত্র তিন বিবি। যারা সাধারণ দুনিয়াদার মানুষ, তাদের এক বিবি হইলে চলিতে পারে। কিন্তু যারা রুহানি ফয়েয হাসিল করিতে চায়, তাদের চার বিবি ছাড়া উপায় নাই। আমি চার বিবির ব্যবস্থা কেন করিয়াছি, তোমরা কিছু বুঝিয়াছ? চার দিয়াই এ দুনিয়া, চার দিয়াই আখেরাত। চারদিকে যা দেখ সবই খোদা চার চিজ দিয়া পয়দা করিয়াছেন। চার চিজ দিয়া খোদাতালা আদম সৃষ্টি করিয়া তার হেদায়েতের জন্য চার কেতাব পাঠাইয়াছেন। সেই হেদায়েত পাইতে হইলে মানুষকে চার এমামের চার মযহাব অনুসারে চার তরিকা মানিয়া চলিতে হয়। এইভাবে মানুষকে চারের ফাঁদে ফেলিয়া খোদাতালা চার কুরসির অন্তরালে লুকাইয়া আছেন। এই চারের পরদা ঠেলিয়া আলমে-আমরে নূর-ইয্দানিতে ফানা হইতে হইলে দুনিয়াতে চার বিবির ভজনা করিতে হইবে।

পীর সাহেব সকলকে শুনাইয়া হযরতের রুহের দিকে চাহিয়া বলিলেন : এই বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ করিব?

—তুমি বৃদ্ধ? আমি ষাট বৎসর বয়সে নবম বার বিবাহ করিয়াছিলাম।

পীর সাহেব মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিলেন : না রেসালত-পানা, আমি আর বিবাহ করিব না।

—না করো, ভালোই। কিন্তু তোমার রুহানি কামালিয়ত হাসেল হইবে না। তুমি নূরে ইযদানির জলওয়া বরদাশত করিতে পারিবে না। তোমার মুরিদানের কেহই নফসানিয়তের হাত এড়াইতে পারিবে না।

পীর সাহেব হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিলেন : আমি নিজের জন্য ভাবি না ইয়া রসুলুল্লাহ; কিন্তু যখন আমার মুরিদগণের অনিষ্ট হইবে, তখন বিবাহ করিতে রাযি হইলাম। কিন্তু আমি এক বুড়িকে বিবাহ করিব।

—তুমি তওবা আসতাগফার পড়। তুমি খোদার কলম রদ করিতে চাও? তোমার বিবাহ ঠিক হইয়া আছে। বেহেশতে আমি তার ছবি দেখিয়া আসিয়াছি।

—সে কে, ইয়া রসুলুল্লাহ?

—এই বাড়ির তোমার মুরিদের ছোট ছেলে রজবের স্ত্রী কলিমন।

—ইয়া রসুলুল্লাহ, আমি মুরিদের স্ত্রীকে বিবাহ করিব? সে যে আমার বেটার বউ-এর শামিল।

—ইয়া উম্মতি, আমি আমার পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রীকে নিকাহ্ করিয়াছিলাম, আর তুমি একজন মুরিদের স্ত্রীকে নিকাহ্ করিতে পারিবে না?

—ইয়া রসুলুল্লাহ, সে যে সধবা!

—রজবকে বলো স্ত্রী তালাক দিতে। কলিমন কেবল তোমার জন্যই হালাল। এ মারফতি নিকায় ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হইবে না। আমি আর থাকিতে পারি না। চলিলাম। আররাহমাতুল্লাহ, ইয়া উম্মতি।

মূর্ছিত সুফী সাহেব একটা বিকট চিৎকার করিলেন। পীর সাহেবের অপর-অপর শাগরেদরা তাঁকে সজোরে পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

মুরিদগণের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও পীর সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন : চাই না আমি রুহানি কামালিয়ত। আমি মুরিদের বউকে বিবাহ করিতে পারিব না।

গ্রাম্য মুরিদগণ আখেরাতের ভয়ে পীর সাহেবের অনেক হাতে-পায়ে ধরিল। কিন্তু পীর সাহেব অটল।

এই সময় প্রধান খলিফা সুফী সাহেব স্মরণ করাইয়া দিলেন : এই নিকাহ্ না করিলে কেবল পীর সাহেবের একারই রুহানি নোকসান হইবে না, তাঁর মুরিদগণের সকলের রুহের উপরও বহুত মুসিবত পড়িবে। তখন পীর সাহেব অগত্যা নিজের রেযামন্দি জানাইয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিতে লাগিলেন : সোবহান আল্লাহ! এ সবই কুদরতে এলাহি! তাঁরই শানে-আযিম! আল্লা পাক নিজেই কোরআন-মজিদে ফরমাইয়াছেন : (আরবি ও উর্দু).....।

বাপ-চাচা পাড়া-পড়শির অনুরোধে, আদেশে, তিরস্কারে ও অবশেষে উৎপীড়নে, তিষ্ঠিতে না-পারিয়া রজব তার একবছর আগে বিয়া-করা আদরের স্ত্রীকে তালাক দিল এবং কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

কলিমনের ঘন-ঘন মূর্ছার মধ্যে অতিশয় ত্রস্ততার সঙ্গে শুভকার্য সমাধা হইয়া গেল।

এমদাদ স্তম্ভিত হইয়া বরবেশে সজ্জিত পীর সাহেবের দিকে চাহিয়া ছিল। তার চোখ হইতে আগুন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছিল।

এইবার তার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে একলাফে বরাসনে-উপবিষ্ট পীর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁর মেহদি-রঞ্জিত দাড়ি ধরিয়া হেঁচকা টান মারিয়া বলিল : রে ভণ্ড শয়তান! নিজের পাপ-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দুইটা তরুণ প্রাণ এমন দুঃখময় করিয়া দিতে তোর বুকে বাজিল না?

আর বলিতে পারিল না। শাগরেদ-মুরিদরা সকলে মার্‌মার্ করিয়া আসিয়া এমদাদকে ধরিয়া ফেলিল এবং চড়-চাপড় মারিতে লাগিল।

এমদাদ গ্রামের মাতব্বর সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল : তোমরা নিতান্ত মূর্খ। এই ভণ্ডের চালাকি বুঝিতে পারিতেছ না? নিজের শখ মিটাইবার জন্য সে হযরত পয়গম্বর সাহেবকে লইয়া তামাশা করিয়া তাঁর অপমান করিতেছে। তোমরা এই শয়তানকে পুলিশে দাও।

পীর সাহেবের প্রতি এমদাদের বেয়াদবিতে মুরিদরা ইতিপূর্বে একটু অসন্তুষ্ট হইয়াই ছিল। এবার তার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ হইল। মাতব্বর সাহেব হুকুম করিলেন : এই পাগলটা আমাদের হুযুর কেবলার অপমান করিতেছে। তোমরা কয়েকজন ইহাকে কান ধরিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিয়া আসো।

ভূলুণ্ঠিত পীর সাহেব ইতিমধ্যে উঠিয়া 'আসতাগফেরুল্লাহ্' পড়িতে পড়িতে তাঁর আলুলায়িত দাড়িতে আঙুল দিয়া চিরুনি করিতেছিলেন। মাতব্বর সাহেবের হুকুমের পিঠে তিনি হুকুম করিলেন : দেখিস বাবারা, ওকে বেশি মারপিট করিস না। ও পাগল। ওর মাথা খারাপ। ওর বাপ ওকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল। অনেক তাবিয দিলাম। কিন্তু কোনো ফল হইল না। খোদা যাকে শাফা না দেন, তাকে কে ভালো করিতে পারে? (আরবি ও উর্দু)।

আস্‌হাব উদ্দীন আহম্‌দ [১৯১৪ —]

সের এক আনা মাত্র

এবার খেজুর রস চুরির প্রসঙ্গে আসা যাক। 'না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়' এ-কথা শুধু রামসুন্দর মশাই নয়, সবাই বলেন। কিন্তু 'বলিয়া লইলে ডাকাতি করা হয়' এ-কথা কেউ বলে না। কারণ, চোরকে সবাই ঘৃণা করে। ডাকাতকে সবাই ভয় করে। চোরকে সকলে ধিক্কার দেয়। ডাকাত দেখলে সকলে চিৎকার দেয়। চোর ধরা পড়লে কিল ঘুসি মারার জন্যে সবাই ঘর থেকে দৌড়ে যায়। ডাকাত পড়লে গৃহস্থের আর্তনাদেও কেউ সহজে ঘর থেকে বের হতে চায় না। চোরের নজর মালের ওপর। ডাকাতের নজর জানমাল দুয়ের ওপর। চোর চুরি করে মালের লোভে। ডাকাত ডাকাতি করে কিছুটা এড্‌ভেন্‌চারের তাগিদেও। তাই তো আরাম-আয়াস, আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-ব্যসনের প্রচুর আয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনেক জমিদার নন্দন এড্‌ভেন্‌চারের তাগিদে ডাকাত হিসেবে দেশজোড়া 'খ্যাতি' অর্জন করেছে।

[এক জমিদার নন্দন তো 'ডাকাত ট্রেনিং কলেজ' প্রতিষ্ঠা করে অধ্যক্ষ হয়ে বসে আছেন। এ কলেজের ভর্তি ফি অন্যান্য কলেজের ভর্তি ফির চেয়ে বেশি নয়, আড়াই শ' টাকা। কিন্তু এড্‌মিশন টেস্ট (ভর্তি পরীক্ষা) বেশ কঠিন। ভর্তিপ্রার্থীকে একচোট বেদম প্রহার করা হয়। পিটুনির সময় 'আহা' 'উহু' করলে, কোনোরকম 'নার্ভাসনেস' দেখালে প্রার্থীকে 'ডিস্‌কোয়ালিফাইড্‌' (অযোগ্য) ঘোষণা করা হয়। কারণ এ-ধরনের ডাকাত, দারোগার প্রথম পিটুনিতেই 'গ্যাং'-এর সবার নাম বলে ফেলবে। কড়া পিটুনির পরও যে-প্রার্থী ধীরস্থির, অনড়, অটল থাকে সেই ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হয়। প্রথমে তাকে ছোট-ছোট ছিনতাই ও ডাকাতিতে দেয়া হয়। এতে মেধার পরিচয় দিতে পারলে বড় বড় ডাকাতিতে পাঠান হয়। তার পাওনাও দ্বিগুণ-তিনগুণ বেড়ে যায়। সবকিছুই শিখতে হয়। যে-কোনো ধরনের জ্ঞান চর্চাসাপেক্ষ। ডিকোয়েন্‌সি বলেছেন, 'মার্ডার ইজ্‌ এ ফাইন আর্ট।' 'তুমি কেমন করে খুন কর, হে খুনী, আমি অবাক হয়ে শুনি।' ডাকাতিও অবশ্যিই একটি ফাইন আর্ট। অপরিসীম শ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে এর কলাকুশলতা আয়ত্ত করতে না-পারলে, অন্তর্নিহিত উপস্থিত বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতমানের বিকাশ ঘটাতে না-পারলে কোনো ডাকাতের পক্ষেই জনসাধারণের কাছ থেকে 'দুর্ধর্ষ' উপাধি লাভ করা সম্ভব নয়।]

ঝগড়াটে গৃহী ও গৃহিণীকে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করে ডাকাত যে-উৎকট আনন্দ পায়, তার কাছে হার ছিনিয়ে নেবার আনন্দও হার মানে। চোরের বিচার ছোট হাকিমের কাছে। ডাকাতের বিচার হয় সেশন জজের কাছে জুরি-সমেত বসে। জেলেও চোরের চেয়ে ডাকাতের মর্যাদা অনেক উচ্চে। 'ডেকইটি উইথ মার্ডার' হলে তো কথা নেই। বেটার দেমাগ দেখে কে।

তাই জেলে ঢুকে অনেক চোর নিজেকে ডাকাত বলে মিথ্যে পরিচয় দেয়। কিংবা অভিজ্ঞ ডাকাতের কাছে সবক নিতে শুরু করে। জেলাররা চোরকে পাত্তা দেয় না। ডাকাতকে তারা মান্য না করলেও গণ্য তো করে। চোর চুরি ছেড়ে চানাচুর বিক্রি করে। ডাকাত ডাকাতি ছেড়ে ঋষি বাল্মীকি বা নিজামুদ্দীন আউলিয়া হন।

চোর ও ডাকাতের মর্যাদার এই শ্রেণীগত তারতম্যের রহস্যের সন্ধান ঐতিহাসিক বস্তুবাদেই ভালো পাওয়া যাবে। অর্থনৈতিক কারণে অর্থাৎ উৎপাদন-পদ্ধতির পার্থক্য থেকে চোর ও ডাকাতের এই সামাজিক মর্যাদার পার্থক্যের উদ্ভব হয়েছে। চোরের উৎপাদন-যন্ত্র হল আদিম লৌহযুগের একটুকরো সিঁধকাঠি। এককভাবে সে এই হাতিয়ার ব্যবহার করে। ডাকাতের উৎপাদন-যন্ত্র হল বুর্জোয়া আমলের রিভলবার, রাইফেল, ব্রেনগান, স্টেনগান, এল.এম.জি., এস.এম.জি., সাতব্যাটারি-টর্চ। পুঁজিপতির যেমন রয়েছে উৎপাদনের জন্যে একটা বিরাট শ্রমবাহিনী, ডাকাত দলপতিরও তেমনি রয়েছে এক দুর্ধর্ষবাহিনী। পুঁজিভিত্তিক উৎপাদনের লভ্যাংশের সিংহভাগ পুঁজিপতির। লুণ্ঠিত দ্রব্যের সিংহভাগও দলপতির। 'এন্টারপ্রাইজ' বা উদ্যোগ তো তাঁরই। বাকিরা যা পায় তা তো মজুরিস্বরূপ। একশ' জন চোর স্ব-স্ব বাছাই করা কুঠুরিতে পৃথকভাবে সারারাত চুরি করে যা 'উৎপাদন' করে, ডাকাত-সর্দার মাত্র জনকয়েক ডাকাত নিয়ে উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমবায় পদ্ধতিতে দু-তিন শ্রম-ঘণ্টায় তার শতগুণ বেশি 'উৎপাদন' করে। চুরি হল কুটিরশিল্প। চোর হল গ্রাম্য গরিব তাঁতি। তার তুলনায় ডাকাতি হল বৃহদায়তন শিল্প। ডাকাত হল বিদ্যুৎচালিত টেক্সটাইল মিল মালিক। সমাজতান্ত্রিক দেশের এক নেতা তো অহরহ বলে বেড়াচ্ছেন, আপনারা পুঁজিপতি আর ডাকাতের মধ্যে কোনো পার্থক্যই করবেন না। চুরি করতে গিয়ে ভাগ্যবরাত চোর যদি গৃহস্থের শখের বন্দুকটি হাত করতে পারে, অমনি চোর তার শ্রেণী-চরিত্র বিসর্জন দিয়ে ডাকাতের শ্রেণীতে উন্নীত হয়।

[উৎপাদন-পদ্ধতির যত দ্রুত উৎকর্ষ সাধিত হয়, উৎপাদনের হারও তত দ্রুত বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের 'ফরচ্যুন' ম্যাগাজিন হতে উদ্ধৃত কলকাতার ১৯৫৯ সালের ৩০ ডিসেম্বরের 'স্টেট্সম্যানের' পেছনের দিকের খবর হল, স্বাধীন বিশ্বের তীর্থস্থল মার্কিন মুল্লুকে গত নয় বছরে ব্যাংক-ডাকাতির প্রকোপ পনের গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংক-ডাকাতি অন্যান্য উৎপাদনকে হার মানিয়েছে। ১৯৪৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংক-লুটের সংখ্যা ছিল মাত্র চব্বিশ। ১৯৫৯ সালের ৩১ আগস্ট যে-বছর শেষ হল, সে-বছর ব্যাংক-লুটের সংখ্যা হল ছ'শ' চল্লিশ। নিশ্চয়ই ব্যাংক-লুটের সুলভ ও নানান উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রয়েছে উচ্চ বেতনভুক্ দোকান কর্মচারী, ইন্জিনিয়ার, পৌর নেতা, কোরাস গায়িকা, ডাইনি বুড়ি ও গর্ভবতী স্ত্রী। এফ.বি.আই.-প্রধান মিস্টার এড্গার হুভার আগের থেকেই বলে দিয়েছেন আগামীতে ব্যাংক-ডাকাতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

সংবাদে আরো বলা হয়েছে যে, মার্কিন মুল্লুকে ব্যাংক-ডাকাতি এখন আর গুটিকতক ব্যাংকলুট বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটা সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে দোকানচুরির মতো একটি গণ-অপরাধে, 'ফরচ্যুন'-এর ভাষায় 'পিপল্স ক্রাইম'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। ব্যাংক ডাকাতির 'পিপল্স ক্রাইমে' রূপান্তরকে বুর্জোয়া সমাজের ক্রমবিকাশের এক উচ্চতর পর্যায় বলে ধরে নেওয়া যায়।

আমরা এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছি। একদিকে স্বাধীন বিশ্বের 'পিপল্‌স ক্রাইম', অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের 'পিপল্‌স ডেমোক্রেসি' আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। এ দুয়ের একটি আমাদের বেছে নিতেই হবে। মধ্যপন্থা বলে কিছু নেই।]

[মধ্যপন্থা থাকলেও তা অবশ্যি পরিহার্য। 'খাইরুল উমুরে আওসাতুহা'। মধ্যপন্থাই শ্রেষ্ঠ। যে-যুগে এ দর্শন প্রচারিত হয়, সে-যুগ ওয়ার্কস প্রোগ্রামের রাস্তার মতো বহু আগে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সে-যুগে রাস্তাঘাট ছিল না। অতিশয় দ্রুতগামী যন্ত্রচালিত শকটও তখন আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই রাস্তার মাঝখান দিয়ে নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে চলা যেত। এখন রাস্তার পাশে চলেও ট্রাকের হাত থেকে জান বাঁচান দায়। বাড়ি থেকে বের হওয়া না-হওয়া নিজের ইচ্ছে। ফিরে আসা না-আসা ট্রাক নামক যমদূতের ইচ্ছে। কাজেই সে-যুগের দর্শন এ-যুগে চালাতে গেলে নির্ঘাত মারা পড়ার কথা। আগের দিনে আদা-বেপারীকে মোটেই জাহাজের খবর নিতে হত না। এখন আদা-বেপারী দৈনন্দিন জাহাজের খবর না-রাখলে তার ব্যবসাই অচল। একযুগে অভিজাতরা স্বীয় শ্রেণী-শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম রাখার মতলবে নাক উঁচিয়ে সদম্ভ-প্রচার চালাত—বাঙালের পেটে ঘি হজম হয় না। এ-যুগে বাঙালের পেটে চমৎকার ঘি হজম হচ্ছে। বিশ্বেস না হয়—দয়া করে চীন, উত্তর কোরিয়া ও অন্যান্য মেহনতির রাষ্ট্রে গিয়ে দেখে আসুন। যুগ বদলালে দর্শনও বদলায়। এখন বামে চলারই যুগ। তাছাড়া মধ্যপন্থীদের ওপর যে মাঝে মাঝে উত্তম-মধ্যম বর্ষিত হয়, সে-কথা বেমালুম ভুলে যাওয়াটাও সুবিধের কথা নয়। সুবিধাবাদ থেকেই যত অসুবিধের জন্ম।]

'ফরচ্যুন' বর্ণিত এই 'ফরচ্যুন হান্টার' বা ভাগ্যশিকারিরা আমার মতে চোরও নয়, ডাকাতও নয়। বস্তুবাদী দর্শন বলে, 'সব মুনাফাজাত সম্পত্তিই চুরি।' কাজেই ব্যাংক-ডাকাতিকে চোরের ওপর বাটপাড়ি ছাড়া আর কিইবা বলা যায়?

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে জীবনের সব স্তরে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটছে। কারো ঘর চুরি করতে হলে অন্ধকারে সেই ঘরে গিয়ে সিঁধ কাটতে হয় না। আজকাল নিজ ঘরে বসেই অন্যের ঘর চুরি করা যায়। টেলিফোনের চোঙাতেই অনেক সময় সিঁধকাঠির কাজ সারান যায়।

চুরি-ডাকাতি হলে গৃহস্থ অনেক সময় থানায় খবর দিতে উৎসাহ বোধ করেন না। থানায় গিয়ে তার ওপর দ্বিতীয়বার ডাকাতি চলুক—দৈহিকভাবে আহত, আর্থিক দিক থেকে সর্বস্বান্ত গৃহস্থ তা চান না।

শহরে চোরের উৎপাত সইতে না-পেরে ভাড়াটে বাসা বদলায়। কিন্তু সেজন্যে সে-এলাকার দারোগা বদলি হয় না। বিলেতে রাজার কোনো অপরাধ নেই। এ-দেশে সব অপরাধ জনসাধারণের (ধনবানরা অট্টালিকায় থাকেন। এই ধনবান অসাধারণরা সব অপরাধের ঊর্ধ্বেও থাকেন।)—এমনকি বন্যা, দুর্ভিক্ষ, জলোচ্ছ্বাস, ধানে পোকা লাগা সবই জনসাধারণের পাপকর্মের ফল। আলেমরা এ-কথা প্রচার করেন। জালেমরা এর সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। পিণ্ডিতে বসে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপান কত সহজ। আর এ-সব ধর্মবাক্য যারা জরাজীর্ণ ও ব্যবহারের নিতান্তই অযোগ্য হয়েছে বলে মনে করেন; ধর্ম, সমাজ এবং যা-কিছু শাশ্বত ও পবিত্র তার নিরাপত্তা বিধানের মহৎ উদ্দেশ্যে, তাঁদের নিরাপত্তা আইনে শ্রীঘরের তীর্থে পাঠান হয়, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে এই আশায়। কিন্তু জনাব, হিতে অনেক সময় বিপরীতও হয়।

এ দেশে সততা বাজার থেকে কবে উধাও হয়ে গেছে। কাজেই সত্য ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করা নিছক অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে মরা। সত্যবান বড়ই দরিদ্র, দুর্মূল্য ও টেক্স-জর্জরিত। তাই সত্য ঘটনার প্রমাণ জোগাড় তার সামর্থ্যের বাইরে। কিন্তু মিথ্যে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ সমভিব্যাহারে রথচক্র ঘড়ঘড়িয়ে বীরবিক্রমে মেদিনী কম্পিত করে ধর্মাবতারের বিচারালয়ে প্রবেশ করে। অনেকটা গদাহস্তে ভীমের রঙ্গমঞ্চের বনভূমে প্রবেশের মতো। দুর্নীতির চাপা পড়ে প্রাণ হারাবার ভয়ে নীতির প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাই জীবনের পথ চলতে নিত্য তার চারদিক সশঙ্ক চাহনি। আর যতটা পারে বামে থাকার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা।

এভাবে দুর্নীতির তাণ্ডবনৃত্যে দেশের মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে, তখন বিপ্লবী বন্ধুরা বলেন, যার গণতন্ত্র তার স্বার্থে। বুর্জোয়ার গণতন্ত্র বুর্জোয়ার স্বার্থে। প্রকৃত জনগণতন্ত্রই জনগণের স্বার্থে। বুর্জোয়ার দ্বৈতকণ্ঠের সংগীতে মোহাবিষ্ট হলে চলবে না। এই বিবৃতি-বিশারদদের বাকচাতুর্যে না-আছে মেহনতিদের পেটের জন্যে কিছু। পিঠের জন্যে কিছু থাকলে তাও সম্পূর্ণ চার্টার-অব-ডিমান্ড বিরোধী। উদয়াস্ত খেটে দেহমন যতই ক্লান্তশ্রান্ত হোক-না কেন, ভোটের সময় তারা আপনাকে রাতে ঘুমোতে দেবে না। 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত' এই বাণী নিয়ে বারেবারে আপনার দ্বারে করাঘাত করবে। আর ভোটপর্ব শেষ হলে আপনাকে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোতে উৎসাহিত করবে। (অবশ্য, তেলের পয়সাটা আপনাকেই দিতে হবে।)

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সিল্কের বোরখা তুলতেই পরিষ্কার দেখতে পাবেন বুর্জোয়া একনায়কত্বের দৈত্যমূর্তিটি। এ তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় টোলঘাট, ফেরিঘাট, খাসমহাল, জলমহাল, অফিস কাছারি, এমনকি দয়াময় শেঠজির নিরাময় হাসপাতাল সবই শোষণের আড্ডা। আইন ও শৃঙ্খলার দোহাই শৃঙ্খল-বজায়-রাখার অপকৌশল মাত্র। ডাকাতের ছোরা আর ডাক্তারের ছুরি দুয়েরই লক্ষ্য এক। তবে একটুখানি পার্থক্য আছে বই কি। ডাকাত ছোরা বসিয়ে টাকা আদায় করে। ডাক্তার টাকা আদায় করে ছুরি বসায়। অপারেশন থিয়েটারে রোগীকে শায়িত রেখে নাটকীয়ভাবে সার্জনের টাকা আদায়ের কাহিনী খোকাখুকুর রূপকথা নয়, সত্য ঘটনা।

জমিদার, পুঁজিদার, সরকার—তিনে এক। একে তিন। একে অপরের স্বার্থের পাহারাদারি করে শ্রেণীধর্মের অনুশাসন পালন করে। ব্যক্তি বদলায়। কিন্তু শ্রেণী তার ধর্ম বদলায় না বরং 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ' বলেই মনে করে। সব নীতির সার অর্থনীতি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য।' তার ওপরে শ্রেণী সত্য— 'তাহার উপরে নাই।' এই সত্যই কেরলে লীগ, কংগ্রেস আর জনসঙ্ঘকে একসঙ্ঘ করে। এই সত্যই এটমবোমা বর্ষণকারী মার্কিনি একচেটিয়াবাদী এবং এটমবোমা-খাওয়া জাপানি একচেটিয়াবাদীকে ভ্রাতৃপ্রেমের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

কেউ হয়ত বলে বসবেন, কোনো কাজ হাতে না-পেয়ে আমি শীতকালেই এক অসার আষাঢ়ে গল্পের আসর জমিয়ে বসেছি। আর রসের নামে চারিদিকে শুধু বিক্ষোভের ফেনা উড়াচ্ছি। কিন্তু যাই বলুন, ফেনা তো রসস্রোতে জোয়ারেরই লক্ষণ। তা ছাড়া শুধু রসের ওপরকার ফেনাটুকু দেখলে তো চলবে না। রসের তলার হক-কথার মিছরির কণাগুলোও তো হিসেবে

ধরতে হবে। আষাঢ়ে গল্প যে আষাঢ় মাসেই করতে হবে কিংবা ভাদ্র মাসে করাটা ভদ্রতাবিরুদ্ধ হবে—এমন কোনো কথা নেই।

বিজ্ঞান বলে, ঋতু-পরিবর্তন মানুষের হাতের মুঠোয় এসেছে। ঋতুর গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে বিজ্ঞানীরা তুষার-মরুর শীতকে বসন্তে, ঊষর-মরুর গ্রীষ্মকে বর্ষায় রূপান্তরের কাজে হাত দিয়েছেন। 'যে নদী মরুপথে হারাল ধারা, জানিহে জানি তাও হয় নি হারা।' — তা জেনেই মরু প্রান্তরের তলদেশে হারিয়ে-যাওয়া নদীটি পর্যন্ত এই বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করেছেন। আর সেই নদীর স্রোতকে নতুন খাতে বইয়ে দিয়েছেন। চীনের দুঃখের নদীও আজ সুখের নদীতে রূপান্তরিত হয়েছে। জীবনস্রোতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটলে নদীর স্রোতে তা না এসে পারে না। কারণ, জীবনের স্রোত খরস্রোতা নদীর চেয়েও অনেক বেশি ব্যাপক ও বেগবান।

গল্পের বেলায় ঋতুভাগ চলে না। রস ঠিকমতো জমাতে পারলে রস রসোত্তীর্ণ হয়। গল্প ঠিকমতো জমাতে পারলে গল্প কালোত্তীর্ণ হয়। যা রসোত্তীর্ণ তা কালোত্তীর্ণ। যা কালোত্তীর্ণ তা রসোত্তীর্ণ। ধরুন, বিয়োগবিধুরা সরলা চাটগেঁয়ে পল্লিবধূর নিরাভরণ সকরুণ আত্মপ্রকাশ : 'এমন রসের কালে প্রাণবন্ধু মোর ঘরে নাই।' এ রসের কাল শীতকাল না বসন্তকাল, না আষাঢ়স্য প্রথম দিবস, না রসই তার কাল—কোনো কালে কোনো অরসিকও তা প্রশ্ন করে নি!

যাক, রস চুরিতেই ফিরে আসি। এ-প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হল, আমাদের রুচি ও মূল্যবোধের যখন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে তখন চুরি-ডাকাতির নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিসমূহ যেমন চুরি-ডাকাতির শিডিউলে স্থান পাওয়া দরকার, ঠিক তেমনি উন্নততর রুচিবোধের তাগিদের রসচুরিকে চুরির পর্যায় থেকে বাদ দেওয়া দরকার। রসুলে করিমের ছহি হাদিস, ইন্নামাল আম্ওয়ালু বিন্‌নিয়তে। প্রত্যেক কাজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য দিয়েই সে-কাজের গুণাগুণ বিচার করতে হবে। সে হিসেবে রসচুরিকে চুরি বলা যায় না। রসে কারো উদরপূর্তি হয় না, কিছু ফুর্তি হয় মাত্র। একআনা দামের একহাঁড়ি রস চুরি করতে যে-শ্রমশক্তি ব্যয় হয়, তা দিয়ে ধানক্ষেত চোরাকাটাই করলে একমাসের খোরাক ঘরে জমা হয়। আসলে রসচুরি নিছক রসিকতা বই আরে কিছু নয়। আগেই তো বলেছি—শত অভাব অনটন, শোষণ, দোহন, আর উন্নয়নের নামে ঊনত্রিশ দফা করজর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও এ-দেশের মানুষ এখনো রসবোধ একেবারে হারিয়ে বসে নি। হাঁস-মুরগি, ছেঁড়া কাঁথা চুরির মামলা হাইকোর্ট এমনকি সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। আজপর্যন্ত রস চুরি গেলে কোনো গৃহস্থ পাড়ার চৌকিদারকেও খবর দিয়েছে বলে কোথাও শুনি নি। আমার বন্ধু রসপ্রিয় চৌধুরীর রসের হাঁড়ি সপ্তাহে তিনবার চুরি যাচ্ছে। কিন্তু এজন্যে একদিনও তাঁকে হাঁড়িমুখ করতে দেখি নি। রস খাওয়ার চেয়ে রস চুরি যাওয়াটা সবাই মিলে কম উপভোগ করি না। এও এক ধরনের রসচর্চা বই কি।

দেশের যখন দুর্ভাগ্য হয় তখন দেশবাসীর স্বার্থে যারা কিছুটা ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত প্রতিক্রিয়াশীলরা শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে তাদেরই দেশত্যাগ করার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। অগত্যা দেশের মায়া কাটাতে না-পেরে দেশে থেকেও তাদের রাতের আঁধারে সশরীরে অশরীরী প্রেতাত্মার মতো ঘুরে বেড়াতে হয়। তাঁরা বাড়ি-বাড়ি খানাতল্লাশ করেন। পুলিশও বাড়ি-বাড়ি তাদের খানাতল্লাশ করে।

কন্‌কনে শীতের রাত। টন্‌টনে হাড়কাঁপানো বাতাস। ঘুটঘুটে অন্ধকার। এমন রাতে তরুণ প্রেমিকও তার বহুবার উপেক্ষিত করুণ আবেদনটি পুনর্নিবেদনের জন্যে অভিসারে বেরুবে না। আমরা তিনে মিলে একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে ছুটে চলেছি। নির্জন প্রান্তরে খেজুর গাছে খস্‌খস্‌ শব্দ। টর্চ মেরে দেখি শ্রীমান রসহরি খেজুর গাছের আগায়।

রসচুরি চৌর্যকার্য তো নয়ই বরং একে রসচর্চার এক নবপর্যায়ই বলা যায়। লোভ সামলাতে না-পেরে কেউ যদি কোটেশন মার্কার সীমা লংঘন করে একটা রসাল মুখরোচক কথাকে নিজেরই উৎপাদিত জিনিস হিসেবে বন্ধুদের পাতে পরিবেশন করেন, তাহলে আমরা কেউ কখনো 'চোর' 'চোর' বলে চিৎকার করে রসভঙ্গ করি না। কিংবা নিজেদেরও চোরাইমালের ভাগদার হয়ে গেলাম বলে মনে করি না। এ-ধরনের রসাল কথা চুরিকে কোনো রসজ্ঞ ব্যক্তি কাকের ময়রার দোকান থেকে ছোঁ মেরে সন্দেশ নিয়ে পালানও বলবে না। কবি হাইন বলেছেন : আমি মধু খেতে ভালোবাসি, যদিও বেশ ভালোভাবেই জানি যে মধুভাণ্ডের প্রতিটি ফোঁটাই ফুলের কাছ থেকে চোরাই করা মাল।

শওকত ওসমান [১৯১৭ —]

মুষ্টিযুদ্ধ লঘুনৃত্য

১

পঁচিশ বৎসর পর এই গল্প-বলার সুযোগ পেলাম।

তার আগে আমি এহেন কর্ম করতে পারতাম না। কারণ কসম খেয়েছিলাম। আমাকে দিব্যি কাটতে হয়েছিল নায়কের সঙ্গে। তাঁর মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পরই শুধু এই রিপোর্ট আমি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারি। অবিশ্যি ঘটনা প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগেকার। সময় আন্দাজ ইংরেজি সন ১৯২০ কি ১৯২১।

কথাটা আরো খোলসা করতে হয়।

এখন আমি পেশায় কলি-সরবরাহের ঠিকাদার। কিন্তু জীবন শুরু করেছিলাম, সাংবাদিক হিসেবে—ক্রীড়া বিভাগের সংবাদদাতা বা আপনারা যাকে হালফিল ভাষায় বলেন, স্পোর্টস্ রিপোর্টার। তখন স্টেডিয়ামের বালাই ছিল না। মাথায় সূর্য ছাড়া আর কেউ ছাতা ধরত না—বলা বাহুল্য। চাষিদের মতো রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে খেলা দেখতাম। ফুটবল, হকি। তখনো ভলিবলের রেওয়াজ হয় নি। পোলো খেলা হত, রিপোর্ট হত না। ইংরেজরা মাঠে গল্‌ফের প্রতিযোগিতা করত, বাংলা কাগজে তার গন্ধও যেত না। উপরন্তু রেসের ঘোড়ার খবরদারির ভারও ছিল আমার উপর। শনিবার-শনিবার এই মহৎকার্যে তখন ঢুঁ মারতাম। কুস্তি-বক্সিং বা মুষ্টিযুদ্ধ শুরু হয়েছে, তবে তেমন জনপ্রিয় হয় নি।

কেন জানি না, ক্রীড়া বিভাগের এই দফাটুকু আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। বড় ফুটবল খেলা ছেড়ে, আমি গন্ধ পেলে সোজা দৌড়াতাম বক্সিং-এর রিঙের সীমানায়। ঘুসোঘুসি দেখার চেয়ে মজার কোনো জিনিস আছে দুনিয়ায় আমি ভাবতে পারতাম না।

রিপোর্টার হিসাবে কর্ম ছিল সকালে চা খাওয়ার সময় খেলার নোটিশগুলো দেখে নেওয়া। নিজের কাগজে যা-যা দিই, তা জানাই আছে। অন্য কাগজে কী আছে তা-ও সংগ্রহ করা দরকার।

সেদিন আমি অবাক। এমন একটা খবর ! অথচ আমি সংগ্রহ করতে পারলাম না ? লজ্জায় মাথা কাটা যেতে লাগল। এক অখ্যাত কাগজের রিপোর্টার এই সংবাদ 'স্কুপ' করেছে অর্থাৎ দাঁও মেরে আগে বাগিয়েছে। রিপোর্টার হিসেবে ওর খ্যাতি চচ্চর বহু ঊর্ধ্বে উঠে যাবে। পেশাগত হিংসের খোঁচায় সকালের চা তেতো হয়ে গেল।

উক্ত অখ্যাত কাগজে বড় বড় হেডিঙে বেরিয়েছে :

বিশ্বের সবচেয়ে আজব প্রতিযোগিতা--কবি বনাম কুস্তিগীর

একদিকে বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে বিশ্ববিশ্রুত কুস্তিগীর গামা। কুস্তি নয় মুষ্টিযুদ্ধ। স্থান : ভূচর জিম্‌নাসিয়াম ক্লাবের টিনঘেরা মাঠ।

তারপর রিপোর্টার সংবাদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছে : 'ভূচর জিম্‌নাসিয়াম ক্লাবের সদস্যগণ চাঁদার জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হন। তিনি স্বল্প চাঁদা দান করেন। তখন সভ্যগণের কী যেন মন্তব্যের ফলে কবি বলেন যে তার বেশি আর তাঁর দেওয়ার সাধ্য নাই। বেশি চাঁদা সংগ্রহের জন্য তিনি অবশ্যই তাহাদের সাহায্য করিবেন। তখন এক সদস্য প্রস্তাব করে, তিনি যদি কোনো বিশ্ববিশ্রুত কুস্তিগীরের সহিত মুষ্টিযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে যে-পরিমাণ চাঁদা সংগ্রহ হইবে, তদ্দ্বারা শুধু ভূচর ক্লাব কেন আরো বহু ক্লাব নবজীবন লাভ করিবে। কবি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হন। ভূচর ক্লাব পরে গামার সহিত যোগাযোগ করে। তিনিও রাজি হন। একদিকে বিশ্ববিশ্রুত কবি অন্যদিকে বিশ্ববিশ্রুত পাহাল্‌ওয়ান। এই প্রতিযোগিতা অভাবনীয় বইকি। আগামী ..... তারিখে এই মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইবে। সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টি-যে ওই টিনঘেরা মাঠটুকুর দিকে নিবদ্ধ থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই....।'

রিপোর্টার খুব রসিকতার সঙ্গে আরো ঘটনা পরিবেশন করেছিলেন। সে কথার দিকে আমার আদৌ মন ছিল না। কারণ, পূর্বেই বলেছি, পেশাদারি ঈর্ষা।

পুকুর ঘুলিয়ে ফেললে মাছের যে-দশা, আমার মনে হয়, শুধু শহর কেন গোটা পৃথিবীর তখন সেই হালৎ। দুনিয়ার অন্যান্য ঘটনা এই প্রতিযোগিতার মুখে থিতিয়ে গিয়েছিল। দেশ-বিদেশের সাংবাদিক হাজার মাইল পার হয়ে এসে পৌছাল। শহরে হোটেলে ঠাঁই পাওয়া দায়। আত্মীয়-স্বজনের ঝামেলা কোন্ পরিবারকে না সহ্য করতে হয়েছে? শহরের লোকসংখ্যা ক'দিন থেকে বেড়ে গেল। দুনিয়ার এ আজব তামাশা কার না দেখার শখ? যারা বঞ্চিতের দলে, তারা ভাবল এই জন্মই বৃথা। ভূচর ক্লাবের মাঠে তো জায়গা কুলাবে না। তাই পৌরসভা পর্যন্ত এগিয়ে এল আরো বিরাট বেবহা মাঠ ছেড়ে দিতে যেন সহজে কেউ নিরাশ না হয়।

সাংবাদিক হিসেবে অবিশ্যি আমার ব্যক্তিগত কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু বন্ধুবান্ধব, বন্ধুবান্ধবদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সুপারিশসহ এসে ছেঁকে ধরল—টিকেট দাও। আর সব বায়না তো দুনিয়া থেকে লোপ পেয়ে গেছে। টিকেট দাও, টিকেট দাও। শেষে ব্লাকমার্কেটে পাঁচটাকার টিকেট পঞ্চাশে বিক্রি! তা-ও দুষ্প্রাপ্য! সেই সময়কার তুমুল উত্তেজনার আঁচ দেওয়া সত্যি অসম্ভব। গোটা পৃথিবী যেন তোলপাড় হয়ে গেল, যা তিন বছর আগে অনুষ্ঠিত প্রথম মহাযুদ্ধেও দেখা যায় নি।

অবশ্যি এইসময় সভাসমিতির হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। সভা, শুধু প্রতিবাদসভা। রবীন্দ্র-ভক্তরা রীতিমতো দেশময় আর-এক প্রচার চালাল : মুষ্টিযুদ্ধ একটা বর্বরতা। বিশ্বের বিস্ময় এই প্রৌঢ় কবিকে এইভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া অন্যায়। কিন্তু তাদের মুখ বন্ধ করলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে বিবৃতি দিয়ে। তবু শতশত টেলিগ্রাম পৌছল কবির কাছে। সদ্য মেসোপোটেমিয়া-ফেরৎ হঠাৎ কবিযশে যশস্বী হাবিলদার কাজী নজরুলের কাছে একদল রবীন্দ্র-ভক্ত ধরনা দিল, আপনিই কবিকে নিবৃত্ত করতে পারেন এই দুঃসাহসিক অভিযান থেকে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, পয়লা সারিতে বসে, এই লড়াই দেখার জন্য আমি একশ' টাকার টিকেট কিনেছি। একটা বিবৃতিও দিয়েছিলেন এই প্রতিযোগিতার সপক্ষে। ভূচর জিমনাসিয়াম ক্লাবের সভ্যগণ কবি নজরুলকে তাই একটা কমপ্লিমেন্টারি সম্মানী টিকেট দিয়ে

গিয়েছিলেন। তিনি নিজের টিকেট হারিয়ে ফেলেন। সেজন্য তাঁর আফসোসের সীমা ছিল না। এবম্বিধ হাজার ঘটনার টুকরো প্রবাহে সেই ক'দিন মাৎ ছিল আজ সব স্মরণ করা মুশকিল, উপলব্ধি আরো কঠিন।

প্রতিযোগিতার তারিখে গোটা মহাদেশের বোধ হয় হুঁশগুশ ছিল না। টিকেট পেয়েও চার-পাঁচ ঘণ্টা আগে প্যান্ডেল বাঁধা মাঠের সামনে সবাই জড়ো। আগে থেকে বসে যাওয়াই ভালো। কখন কী হয় কে জানে। কেল্লা থেকে গোরা সিপাই পাঠিয়েছিল ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্যে তখনকার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। দর্শকের দিক থেকে বলা যায়, গোটা পৃথিবী জড়ো হয়েছিল এই প্রতিযোগিতার মাঠে। সুদূর আফ্রিকা থেকে এসেছে নানা গোত্রের কাফ্রিদল। পেরুর এক অধিবাসীকে পর্যন্ত সেদিন দেখেছিলাম। চীন, জাপান—এসব পাঁদাড়, পাঁদাড় কা বাৎ। গোটা দুনিয়া এই আজব তামাশার শরিক। যারা টিকেট পায় নি, নিষ্ফল-হতাশের দল, সহস্র-সহস্র আশপাশে দাঁড়িয়ে বাইরের মজা লুটতে ব্যস্ত, নিরাশার হাঁপানি চেপে।

সাংবাদিকরা সেদিন ভাগ্যবান বলতে হয়। আমিও একদম রিঙের পাশে জায়গা পেয়েছিলাম। যদ্দূর ভালো রিপোর্ট করা যায়, তার জন্যে গোটা বদন-মন একদম টং। আজ দুঃখ হয়—সেই কাগজ উঠে গেছে, তার কপি পাওয়া যায় না আদৌ। নচেৎ সেই পরিবেশন আজ আস্ত তুলে দিতাম। আমার রিপোর্ট হয়েছিল সবচেয়ে সেরা। আমাদের পত্রিকাকে সুনজরে দেখে না, এমন কাগজও পরে তারিফ জানিয়ে পত্র দিয়েছিল। আফসোস, অগোছালো হওয়ার একটা সীমা থাকা উচিত। এমন একটা মূল্যবান দলিল হারিয়ে ফেললাম।

আজ তাই স্মৃতির উপর সব বরাদ্দ।

২.

রেফারি হুইশেল বাজিয়ে দিলে।

রিঙের মধ্যে দুই প্রতিযোগী হাজির। রবীন্দ্রনাথ পরেছেন সাদা হাফপ্যান্ট, পায়ে সাদা কেড্‌স জুতা। আদুল গা। বাবরি চুল ঈষৎ বিন্যস্ত। গোঁফের কোণ শৃঙ্খলা-সাধন করেছেন, মনে হল না। গামার বিরাট শরীর, নগ্ন তো বটেই, তার উপর কালো পরিপাটি লম্বা গোঁফ দেখলে মনে হবে দৈত্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ। তারও গা খালি। পায়ে একই ধরনের কেড্‌স জুতা। পরনে খাকি হাফপ্যান্ট। উভয়ের গ্লাভস বা দস্তানার রঙ বাদামি। গামার পাশে রবি ঠাকুর-কে কিন্তু আদৌ বেখাপ্পা মনে হয় না। একজন দৈত্য আর একজন তো তালপাতার সিপাই নয়। কেবল দেখা গেল রবিঠাকুরের শরীরের তুলনায় পা সত্যি সরু। এইজন্যে শুনেছি তিনি পা আল্‌খো দিয়ে ঢেকে রাখতেন। আজ সরেজমিন দেখলাম।

এবার বক্সিং শুরু হবে। কিন্তু লাখখানেক জন-সমাগমে থৈথৈ প্যান্ডেলের পূর্বপাশ থেকে চিৎকার শোনা গেল : গুরুদেব, এই দুঃসাহস থেকে নিবৃত্ত হন। হৈচৈ আর থামে না। তখন রেফারি কী যেন বললেন কবি-কে। তিনি রিঙের কিনারায় সাদা দড়ির উপর দস্তানা-পরা হাত রেখে সম্বোধন করলেন, অতি মিহি গলায়, 'বৎসগণ !' বিরাট শরীরে এমন চিকন স্বরের বাসা, সেদিন নিজ কানে শুনলাম।

কবি বললেন, 'বৎসগণ, শান্ত হও। দেখা যাচ্ছে, তোমরা আমার প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেও আমার বই তোমরা পড়ো না। জীবনস্মৃতি যদি পড়ে থাকো, খোঁজ পাবে বাবা-মশায়ের হুকুমে

আমাদের খালিগায়ে ধুলোমাটির উপর দারওয়ানদের সঙ্গে কুস্তি করতে হত। সুতরাং আমি শরীরচর্চার সঙ্গে পরিচিত নই, তোমরা মনে জায়গা দিও না। এই লড়াই একতরফা হবে না, আমি তোমাদের আশ্বাস দিতে পারি। লড়াইকে ভয় পাও কেন? ঐ দ্যাখো এক লড়ুয়ে কবি—ও তলওয়ার দিয়ে দাঁড়ি চাঁচে, লড়াইকে ভয় পায় না।'

কবির আঙুল এবার পয়লা সারিতে উপবিষ্ট কাজী নজরুলের উপর নিবদ্ধ। সব দৃষ্টি সেই দিকে তখন ঝেঁটিয়ে পড়ে। কিন্তু গোলমাল কিছু থামলেও একেবারে থামে না।

কবি তখন সম্বোধন করেন, 'বোঝা যায় তোমরা আমার বই পড়ো না। আচ্ছা আমার গান তো শোনো? না তা-ও ফক্কা। একটা গান শোনো।'

কবি গান ধরলেন : 'আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।

আশা করি এই গানের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আমার মধ্যে আরো কী আছে তোমরা জান না। আজ দেখে যাও।'

গোটা প্যান্ডেল চুপ। এবার বক্সিং শুরু হবে। রেফারি দুই প্রতিযোগীকে পরিচয় করিয়ে দেবে, কর তো আর নেই, গ্লাভস বা দস্তানা-মর্দন মারফৎ।

তার আগে কবির কাছে চ্যাম্পিয়ন পাহালওয়ান এগিয়ে এসে বললে, 'আপ হামকো পাহ্চান্তে?'

কবি হেসে উঠে জবাব দিলেন, 'এ-পর্যন্ত শতশত গান লিখেছি। সারা জীবন সা—রে—গা—মা, আর গামা-কে চিনব না?'

গামা হেসে উঠল। 'আজ হামাকে আওর ভি চিন্বেন।'

রেফারি আর দেরি করতে নারাজ। দুই যোদ্ধার হ্যান্ডশেকের পর সে হুইশেল বাজিয়ে দিল। ফাইট শুরু হয়ে গেল।

আমি তো প্রথম মিনিটে একটা নক্-আউট অঘটন দেখার জন্যে উৎকণ্ঠিত ছিলাম। গামা কুস্তিগীর। পাঞ্জায় জোর কত। আজ না হয় মুষ্টিযোদ্ধা। কিন্তু হাতের কুওত যাবে কোথায়? একটা ঘুসি। ব্যস, কবি তো সর্ষেফুল দেখবে নয়নে নয়নে অথবা আকাশ-চয়নে।

কিন্তু আমার ধারণা ভুল।

প্রৌঢ় কবির দিকে তাকাও। একদম পাক্কা মুষ্টিযোদ্ধা। ঠিক কায়দামতো একটু ঝুঁকে লড়ছেন। বাম হাত দিয়ে আগল দিচ্ছেন। পায়ের ক্ষিপ্রতায় বিড়ালও হার মানে। ভড়কি দিতে গেল গামা। মুখের দিকে সোজা 'হুক' করতে গিয়ে পেটের দিকে ঘুসি চালাল। ওস্তাদ কবি। দুইহাত ঠিক পেটের উপর। তারপর সোজা ছোট লাফ দিয়ে একটু পেছিয়ে গেলেন। তখন গামা এগিয়ে গিয়ে বাম হাত চালাল ঠিক কবির মুখ বরাবর। ও আল্লাহ, এবার আর সামলাতে পারবেন না। কিন্তু কথার জহুরি, কৌশলেরও জহুরি। একদম পাকা বক্সারের মতো কোমর থেকে দেহ একদিকে হেলিয়ে দিলেন। ঘুসি পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত প্যান্ডেল স্তব্ধ। উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, কৌতূহল—সবকিছু মিলে একাকার। গোটা জনতা যেন এখন একদেহ। সজীব শুধু ওই তিন প্রাণী। রেফারি এবং দুই যোদ্ধা।

গামা বড় ঠেসে ধরেছে। রবিঠাকুর পেছাতে পেছাতে একদম রিঙের এককোণে পড়ে গেছেন, আর রক্ষা নেই! ঠোকা ঘুসি চালাচ্ছে গামা চিবুক বরাবর। একদম ভীষণ 'আপার কাট'। কবি চট করে হাঁটু মুড়ে গামার কোলে যেন সেঁধিয়ে গেলেন। তারপর কনুয়ে কনুই রেখে

গামার দুইহাতের পেশির উপর চাপ দিতে থাকেন। দক্ষ বক্সারের এইসব কায়দা, শত্রুকে হাল্লাক করে দেওয়ার কায়দা কবি ভালোমতোই জানেন। এসব শিখলেন কোথা থেকে? বালক-কালের কথা কি এখনো মনে আছে?

রেফারি হুইশেল বাজিয়ে দিলে। প্রথম রাউন্ড শেষ হল। আমরা হাঁফ ছাড়লাম। দেখলাম, কবি ঘামছেন, কিন্তু ক্লান্ত নন। রবীন্দ্র-দল মনে মনে বোধহয় দুর্গা জপছিল, সব চুপ। একরাউন্ড গামার সঙ্গে টেকাও তো এক মহাবিস্ময়।

সেকেন্ড রাউন্ড শুরু হয়ে গেল। আমরা উৎকণ্ঠিত, দেখা যাক কী হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু লড়ছেন দক্ষতা-মাফিক, নিয়ম-মতো। একবারও দেখছেন না তিনি প্রতিপক্ষের বাম দিক দিয়ে ঘুরছেন। ভড়কি সামাল দিচ্ছেন একদম ঠাণ্ডা মাথায়। সুযোগ পেলে সোজা ঘুসি চালাচ্ছেন। তার পায়ের ক্ষিপ্রগতি দেখার মতো। চিবুক একটু নিচে রেখে চমৎকার গার্ড রাখলেন নিজের দেহের উপর। কনুই পেটের কাছে এমন রাখা, ঘুসি যথাস্থানে পৌঁছায় না। একবার কাছে গিয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ, চিবুক তখন বুকে ঠেকানো। গামা ঠিক কায়দায় আনতে পারছেন না। কিন্তু সেকেন্ড রাউন্ড শেষ হওয়ার আগে কবি একবার ভুল করে বসলেন। তিনি বাঁ দিক দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘুরতে গেলেন। তখন গামার একটা 'সুইং' ঘুসি এসে পড়ল চোয়ালের উপর। পুরোপুরি লাগল না কবির চোয়ালে। কিন্তু গামার ঘুষি তো। তিনি আর তাল সামলাতে পারলেন না। মুখ গুঁজে মঞ্চের উপর পড়ে গেলেন। গামা সিংহের মতো ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়তে থাকল ভূলুণ্ঠিত শিকারের দিকে চেয়ে।

রেফারি গণনা শুরু করে। এক—দুই-তিন—চার—পাঁচ—।

ওদিকে প্যান্ডেলে রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে তখন মহরমি মাতম শুরু হয়ে গেছে। 'হায় গুরুদেব, হায় গুরুদেব—এ্যাম্বুলেন্স এ্যাম্বুলেন্স—।' ইত্যাদি রব।

ছয়, সাত, আট। রেফারি গুণে চলছে। কবিসম্রাট তখন মঞ্চের উপর। তবে শরীর নড়ছে। দুই দস্তানার উপর তার মুখ। নাক ঘষছেন।

নয়—, রেফারি হেঁকে উঠল।

রবীন্দ্রনাথ উঠছেন ধীরে-ধীরে।

বিরাট হাততালির রব।

দশ গুণতে হল না, আবার লড়াই শুরু করলেন। নিজে এক-আধ ঘুসি খেয়েও এগোন। সর্বদা চঞ্চল। তিনি জানেন, চলন্ত জিনিসে আঘাত করা যায় না। কিন্তু কবি কিছু ক্লান্ত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল। কপালে ঘামের স্রোত। এইসময় কবির কৌশল প্রধানত প্রতিপক্ষের ঘুসি ঠেকানোর জন্যে তার বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন, তারপর তার হাতের পেশির উপর চাপ দেন। আরো ক্লান্ত হোক প্রতিপক্ষ। ঠিক এইরকম অবস্থায় তিনি হঠাৎ গামার নাকের কাছে এক পাঞ্চ ঝাড়লেন। বিদ্যুৎবেগে একটু তফাতে সরতে তাঁর দেরি হয় নি।

ও আল্লাহ, গামা যেন হঠাৎ আঁৎকে উঠল। তার দুই নাসারন্ধ্র চোখের দিকে ঝিলিক খায়। সেই সুযোগে কবি আর এক পাঞ্চ চালালেন বাঁ দিকের চোয়ালের উপর নাকের নিচে।

হ্যাচ্চো—হ্যাচ্চো।

গামা হাঁচতে শুরু করেছে। হ্যাচ্চো, হ্যাচ্চো। গামা পা ঠিক রাখতে পারছে না। বার বার নাসারন্ধ্র কেঁপে ওঠে তার। বিস্ফারিত মুখ, জিভ পর্যন্ত দেখা যায়। কবি সেই সুযোগে

বিদ্যুৎগতিতে সোজা হুক্ চালান পেটে, মুখের উপর। সব যেন আচমকা ধাঁই ধাঁই পড়ছে। কারণ, গামার আর লক্ষ্য নেই প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর। টলতে শুরু করেছে সে। কবি শেষে এই 'সুইং' ঘুসি ঝাড়লেন। কোমর থেকে ঘোরানো দেহ, দেহভার ডান পা থেকে তখন বাম পায়ে ন্যস্ত। একদম মোক্ষম মার।

গামা পড়ে গেল মঞ্চের উপর মুখ গুঁজে ! আর হাঁচতে লাগল ঘন ঘন। হ্যাচ্চো, হ্যাচ্চো।

অবিশ্বাস্য !

অবিশ্বাস্য !

অসম্ভব, অসম্ভব !

রেফারি গণনা শুরু করেছে। ওয়ান, টু, থ্রি.. টেন্...দশ....কিন্তু কে আর উঠবে? একদম নক্ আউট। গামা চিৎপটাং।

পরবর্তী দৃশ্য আপনারা কল্পনা করুন। বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য আমার সেদিন হয়ত ছিল, আজ আর নেই। এমন অলৌকিক কাণ্ডের ফিরিস্তি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হয়ত দিতে পারতেন। পরবর্তী একসপ্তাহে গোটা পৃথিবীতে সেই মোজেজার (অলৌকিকতার) জের চলল নানা ভাবে।

আমার কিন্তু পাগল হওয়ার উপক্রম। এই যুগে এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড কীভাবে ঘটতে পারে? রবীন্দ্র-ভক্তের দল ক'দিন চিৎকারে শহরে কাক-চিল বসতে দিল না। তেত্রিশ কোটি ঠাকুর থাকা সত্ত্বেও আর একটি ঠাকুর দেশে বাড়ল।

আমার সন্দিগ্ধ মনে কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই 'থৈ' পায় না। ব্যাপারটা স্নায়ু-রোগীর অবদমিত ইচ্ছার মতো আমার মনে বিকৃতি নিয়ে চেপে বসল। নজরুল ইসলামের কাছে ধাওয়া করেছিলাম। তিনি বললেন, 'কবি লড়াইয়ে জিৎবে না তো কে জিৎবে?' এ তো নিজ পেশার সাফাই কীর্তন। তাই একদিন কপাল-ঠুকে কবির বাড়িতেই হানা দিলাম। জমিদার মানুষ। দেউড়ির মধ্যে সেঁধোনো কি অত সহজ! সুপারিশ পাকড়ে একদিন সোজা কবির খাস-কামরায় হাজির হওয়ার অনুমতি পেয়ে গেলাম। 'কিসের জন্যে এসেছিস?' সেই মিহি কণ্ঠ আবার নতুন করে শুনলাম। আজ কবির যোদ্ধবেশ নেই। পরনে গরদের চেলি, গায়ে রেশমি পাঞ্জাবি, উপরে আলখো। যিশুখৃস্ট-সদৃশ সাদা দাড়ির বনে তীক্ষ্নদৃষ্টি চোখের দিকে আজ তাকাতে পারলাম না।

'আপনাকে দেখতে এসেছি।'

'বেশ বেশ।'

অতিথি-আপ্যায়নের ঘটা গেল কিছুক্ষণ। কয়েক রকমের মিষ্টি তস্তরিতে রাখা। কবি সদ্ব্যবহারের অনুরোধ জানান।

'কিন্তু আমি খাব না।' বেশ দৃঢ়কণ্ঠ অথবা আবদারের সুরে জবাব দিলাম।

'কেন খাবি না?'

'আমার একটা কথার জবাব যদি দেন, তবে আমি খেতে পারি।'

'তোর নাম কী?'

'ইদরীস আলী।'

'তোর ঈদৃশ ব্যবহার কেন? তুই কি জানিস নে অতিথি না-খেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।'

'আমার কথার জবাব না-দিলে আমি খাব না।'

'কী তোর জিজ্ঞাসা? তুই তো নাছোড়বান্দা, এখন বল্ দেখি।'

'আপনি কী করে বক্সিঙে জিৎলেন?'

'লড়ে জিৎলাম।'

'কিন্তু এ ব্যাখ্যায় মন ভরে না।'

'তুই দেখছি এক নাছোড়বান্দা। আচ্ছা—', একটু থেমে 'ইতস্তত ভাব' কাটিয়ে কবিগুরু উচ্চারণ করেন, 'তোকে বলতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত—।'

'কী শর্ত, বলুন?'

'আমার মৃত্যুর পঁচিশ বৎসর পরে এই রহস্য তুই আর কারো কাছে ফাঁস করতে পারিস। তার আগে না। ওয়াদা খেলাপ করবি নে তো?'

'অবিশ্যি না, কবিগুরু।'

'তবে শোন্। গায়ে জোর তো আছে জানিস্। আমার মেহনতের কথা ভেবে দ্যাখ। তোরা তো মজায় পড়িস। কিন্তু আমাকে কী করতে হয়?'

'বহুৎ বহুৎ মেহনৎ।'

'বহুৎ আচ্ছা। ঠিক ধরেছিস। তার জন্যে গায়ে তাগদ দরকার হয়। মানুষ মাত্রই বীর্যের সাধনা করা উচিত। কিন্তু মূর্খ, গুণ্ডা, সমাজ-বিরোধী জানোয়ারদের মতো তোর বল অপরকে দেখানোর জন্যে নয়। তোর বল থাকবে ঢাকা, যেমন পাহাড়ি ফুলে পাহাড়ের গা ঢাকা থাকে। আমি বাইরে নরম। ভেতরে উল্টো। তোরা আমার এমন নকল শুরু করেছিস যে তোদের নামের পাশে প্রথম বন্ধনীতে পুং লিখতে হয়।'

'তা আপনার আশ্রম থেকেই শুরু হয়েছে, কবি-সম্রাট।'

'তা ঠিক। যেতে দে সে-কথা। এখন শোন্। হঠাৎ বলে ফেলেছিলাম লড়ব। কথা দিয়ে আর পেছানো চলে না। তাই লড়তে গেলাম। গায়ের জোর দেখাতে হল। কিন্তু জোরই সব কথা নয়। থোড়া আক্কেলও লাগে। একরাউন্ড লড়ার পর মনে মনে ভাবলাম, এইভাবে বেশিক্ষণ চলবে না। দ্বিতীয় রাউন্ডে পড়ে গেলাম। তুই তো জানিস। বক্সিঙে পড়ে গিয়ে চট করে উঠতে নেই। তাতে শরীর আরো কাহিল হয়ে যায়। ধীরে ধীরে উঠতে হয়। তবে দম পাওয়া যায়। তাই উঠতে সেদিন দেরি হচ্ছিল। তখন মাথায় একটা ফন্দি এল। লুকিয়ে ছাপিয়ে আমাদের কোনো-না-কোনো নেশা করতে হয়। মাঝে মাঝে নস্যি নিয়ে থাকি। তখন মনে হল নাকে কিছু জমা আছে। ওটা যদি দস্তানা মারফৎ হাজির হয় প্রতিপক্ষের নাকে, তা-হলে একটা মজা হবে বটে—।'

রবীন্দ্রনাথ তারপর হাসতে থাকেন এবং পরে তা থামিয়ে বলেন, 'কাহিনীর আর কী শুনবি? তারপর তো সব নিজের চোখেই দেখেছিস।'

আমি মিষ্টি মুখে ঠেসে তখন কবির হাসির সঙ্গে যোগ দিয়েছি। বিষম খাই আর কী।

কবিগুরু কিন্তু হঠাৎ কিছু গম্ভীর হয়েই ফের বললেন, 'শোন্। বল—জোর—এসব শেষ কথা নয় দুনিয়ায়। তা-হলে দুনিয়ায় হাতি, গণ্ডার রাজত্ব করত। যাক্, সে কথা। ওয়াদা খেলাপ করিসনে কিন্তু—।'

'আলবৎ না, কবিগুরু।'

'মনে রাখিস, আমার মৃত্যুর পর পঁচিশ বছর—।'

তাজমিলুর রহমান [১৯২৫ —]

নামকরণ

হযরত আদম (আঃ) এবং বিবি হাওয়া দুনিয়ার আদি পুরুষ এবং নারী। পৃথিবীতে মানুষ বরাবর এই দু-জন থাকলে অন্তত নাম রাখার ঝামেলা ভবিষ্যতে আমাদের কাউকেই সহ্য করতে হত না। কিন্তু দুনিয়ার আদি পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে শুরু হল ভবিষ্যৎ দুনিয়ার মানুষ সৃষ্টির আয়োজন। ক্রমে দুই, দশ করে হাজার, হাজার থেকে লাখ—অবশেষে জনসংখ্যা আজ কয়েক শ' কোটিতে দাঁড়িয়েছে।

নাম হল প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব Identification. জনসংখ্যা যে-অনুপাতে বেড়ে চলে, নতুন নামের সন্ধান সে-অনুপাতে করে নেওয়া সম্ভবপর নয়। ফলে নামকরণে শুরু হয়েছে বিবর্তন। সত্যযুগে 'নাম' অপেক্ষা 'কাম'-ই (কাজ) ছিল বেশি লক্ষণীয় এবং অধিকতর কাম্য। এজন্য তখনকার নামকরণ ছিল সংক্ষিপ্ত। য়ুসুফ, জোলেখা, হারুন, লুৎ কিংবা হিন্দুদের মনু, পরাশর, নারায়ণ এবং খৃস্টানদের ডেভিড, জ্যাকোব, মেরী তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ত্রেতা যুগে এবং পরবর্তী দ্বাপরেও একই অবস্থা চলেছে। এই 'নাম' রাখা নিয়ে কেউ 'অনামী' কাজ করতে প্রবৃত্ত হয় নি। ল্যাঠা বাধল এসে কলিযুগে, বিশেষ করে কলির শেষ পর্যায়ে!

কি হিন্দু, কি মুসলমান নিজ-নিজ ধর্ম মোতাবেক যথাক্রমে দেব-দেবী, নৈসর্গিক পূজ্য পদার্থ এবং আল্লাহ্ রসুল ও তাদের 'গুণবাচক' শব্দে নাম রেখে চলছিলেন। যেমন—গোলাম মোস্তফা = মোস্তফার (হজরত মোহম্মদ (দঃ)-এর) দাস। আবদুর রহমান = আল্লাহর দাস। হিন্দুদের শিবকিঙ্কর = শিবের দাস। কৃষ্ণকান্ত = কৃষ্ণের প্রেমিক, দিবাকর = সূর্য, শশধর = চন্দ্র ইত্যাদি নামে ধর্মভীরুতা, রুচিজ্ঞান ফুটে ওঠে। সতী, সাবিত্রী, আছিয়া, আম্বিয়া, আয়েশা, জোলায়খা, এগুলো একসময়ে আদর্শ নামকরণের প্রতীক ছিল, কিন্তু কলিযুগে লোকের মনোযোগ দিল নামকরণের দৈর্ঘ্যের দিকে। যার নাম যত লম্বা, তার নামকরণের সার্থকতাও তত বেশি। রাজা-বাদশাহ্রা পথ দেখালেন। শাসকের নাম এলান দিয়ে জানাতে অনেক দৌবারিকের Lung's এর দফারফা হবার যোগাড়। যেমন বাদশাহর নাম হাঁকতে গিয়ে দৌবারিককে এলান দিতে হত—'সুলতানুস সুলতান, খাকান ইবনুল খাকান, সুলতানুল বাহরাইন শাহানশায়ে হিন্দুস্থান, জিল্লুল্লাহ, আলামপনাহ অমুক' তসরিফ আনছেন। হিন্দুরাও বসে থাকেন নি। তারাও 'প্রবল প্রতাপান্বিত আর্যসূর্য, মহামহিমান্বিত ক্ষত্রকুলপতি, দিগ্বিজয়ী মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত অমুক' লিখে ছেড়েছেন। মধ্যবিত্ত লোকের না ছিল দৌবারিক, না ছিল 'রাজ্যহীন' রাজপাট। তবুও ছেলে-মেয়ের নাম রাখতে গিয়ে তারাও লম্বা দৌড়ে অংশগ্রহণ করতে ছাড়েন নি।

ছেলের আকিকা। নানা, নানি, দাদা, দাদি তো আছেনই, আরও ছোট বড় অনেকে এসেছেন। নানা বললেন, ছেলের নাম রাখা হোক 'জুলফিকার আলী'। নানি তাঁর ভাগ ছাড়বেন কেন? তিনি বললেন, তাঁর নাতির নাম হবে 'শামসুদ্দোজা'। দাদা বেচারা বললেন, 'নুরুল বাসার' নামটা বেশ ভালো হবে। পেছন থেকে দাদি প্রস্তাব দিলেন, 'শামসুল আলম'। এখন ছেলের বাপ বেচারা তো ভেবে হয়রান। কারটা রাখেন, কারটা ছাড়েন। শেষে সবাইকে খুশি করে ছেলের নাম রাখা হল 'শামসুল আলম বদরুদ্দোজা নূরুল বাসার মোহাম্মদ জুলফিকার আলী।' আবার গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ডাক নাম রাখা হল 'ওরফে ফরমান'! একেবারে দিগ্বিজয় আর কী! আসল নামের আগেপিছে যেন মালগাড়ির সারি!

অবস্থা তবু মন্দ চলছিল না। কিন্তু সার্কাস শুরু হল ইংরেজ আমলে। ইংরেজের আগমন আমাদের দেহ-মন-মস্তিষ্কে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে, এ-কথা সত্য। আমরা আমাদের কথাবার্তায়, চাল-চলনে, খানা-পিনায়, ইয়ার-কুটুম্বিতায় ইংরেজের অনেক কিছু ভালো-মন্দ অনুকরণ করে কাজের লোক হতে মেতে উঠেছি! আর এর ঢেউ নামকরণে গিয়েও ধাক্কা দিয়েছে। একটু আলোচনা করা যাক।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আমাদের নাম রাখার বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেক নামের স্বধর্ম মতে একটি অর্থ থাকা। ইংরেজদের অন্য প্রকার। গোটাকতক শব্দ জুড়ে একটা কিছু হলেই তাদের নাম হয়ে গেল—কোনো নামের অর্থ হোক কি না-হোক, তা তাদের দেখবার নয়। যেমন ধরুন William Hazlitt Tennyson, John Cowper Drinkwater, Dwight D. Douglas ইত্যাদি। এমনি জাতীয় নামের কেবল 'শব্দনাম'-ই রয়েছে। অর্থ নেই আর তার প্রয়োজনও নেই। ইংরেজ আমলে আমাদের অর্থবোধক নাম সায়েবি উচ্চারণের চাপে পড়ে খাবি খেতে লাগল। তার না রইল অর্থ, না রইল সৌন্দর্য। সেটা না হল ইংরেজি, না হল বাংলা, না হল আরবি-ফারসি। আমাদের 'মধুসূদন দত্ত' হল 'Madu Shudan Dutt'-ম্যাডু সুড্যান ডাট্। Dictionary দেখে বলতে পারেন এই ম্যাডু, সুড্যান, ডাট্ এর অর্থ কি? উচ্চারণ বিভ্রাটে আমাদের 'আহমদ হল 'আমেদ', 'বক্‌র' হল 'বেকার', 'খোন্দকার' হল 'ক্যান্ডকার'। হিন্দুদের আশুতোষ হল A-tosh, দাস হল ড্যাশ্, বন্দোপাধ্যায় হল ব্যানার্জী, চট্টোপাধ্যায় হল চ্যাটার্জী ইত্যাদি।

আরও মজা হল। আচকানের সঙ্গে হাইহিল, পাজামার সঙ্গে হ্যাট কিংবা খড়ম পায়ে সাইকেল আরোহণ শুরু হল। অর্থাৎ জুলেখা Fancy বানু, তোবারক Beautiful আহমদ, আফতাব Excellent হোসেন ইত্যাদি নাম রাখা শুরু হল। হিন্দুদের Helen মজুমদার, Juliet বিশ্বাস, Mary চ্যাটার্জী, Rebecca দাস একই গোত্রীয়। আশেপাশে খুঁজে দেখুন এমন অনেক Baby হক, Dolly রহমান, Lovely সেন, Beautiful রায় দেখতে পাবেন।

এতসব করেও Demand অনুযায়ী Supply না থাকায় লোকে ঝুঁকে পড়ল গাছপালা, ফল-ফুল, চাঁদ, তারা, পাখি এসবের উপর। অবশ্য এ-ব্যাপারে বেশ ভেবেচিন্তে কাজ চলল। তাই কাঁটালী মিয়া, নারিকেল খাঁ, ঢেঁড়স আহমদ, পটল দাস, কদু রায়, বেগুন সেন, লাউ সরকার এসব কেউ পছন্দ করল না।

শালুক, আনারস, কলা, মরিচ এসবও বাদ পড়ল। ফলের মধ্যেও বাছাই চলল। তরমুজ, শসা, পেঁপে, আলু এসব নামের যোগ্য বলে বিবেচিত হল না। তবে বেদানা, আঙুর, আপেল, ডালিম, কমলা, লেবু ইত্যাদি কিন্তু গ্রহণযোগ্য হল। ফুলের ব্যাপারেও কিছু রেখে, কিছু ছেড়ে

নামকরণের কাজে লাগান হল। গাঁদা, আকন্দ, ধুতরা জাতীয় ফুল নাম-রাখা ব্যাপারে অপাঙক্তেয়। কিন্তু গোলাপ, টগর, বেলি, চামেলি, জুঁই এসব সমাদর পেল। চাঁদ মিয়া, সুরুজ মিয়া, কমরদ্দীন, শামসদ্দীন, লায়লা এসব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও ধ্রুবতারা মিয়া, অমাবস্যা আলী, প্রতিপদ সেন, একাদশী রায়, যোগ্য বিবেচিত হল না।

পাখিদের মধ্য থেকে শকুন, চিল, প্যাঁচা, বাজ, কাক ইত্যাদি বাদ পড়লেও টিয়া, চাতক, ময়না ইত্যাদি বেশ সমাদর পেল।

গ্রাম্য চাষি মজুর ভাইয়েরা ইংরেজের শাসনাধীনে থেকেও তাদের কোনো কিছুই গ্রহণ করল না। নামকরণ ব্যাপারে তারা আদিমই রয়ে গেল। তাই বেঙ্গু মণ্ডল, বেজি ফকির, চিকা সরদার, গবরা কাজি, গুইয়া খাঁ; কিংবা হারু, তারু, কছি, মছি, কলি—উল্লাহ তুল্লাহ উদ্দীন সহযোগে উপাদেয়ভাবে পরিবেশিত হতে লাগল। অবশ্য এদের মধ্যে যারা শহুরে আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে লেখাপড়া শিখে উন্নত হতে লাগল, তারা নাম Modernised করে খাপ খাইয়ে নিল।

'আগে থাকে উল্লাহ, তুল্লাহ
পিছে হয় উদ্দীন
সবার শেষে আমেদ, দীন
কপাল বাড়ে যদ্দিন।'

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় হল যে, জীব-জন্তুর নাম কিন্তু কেউ গ্রহণ করল না। তাই গরু খাঁ, ছাগল মণ্ডল, দামড়া সরদার, ষাঁড় চন্দ্র, মোরগ মিয়া, কি মুরগি বিবি আমলে আনল না।

এতক্ষণ যা বললাম তাতে দেখতে পেলেন যে, নামকরণে এক বিরাট বিবর্তনমূলক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কলির শেষযুগের, মানে এ-যুগের বৈশিষ্ট্য হল বিজ্ঞানের অচিন্তনীয় উন্নতি। মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চাঁদে গিয়ে বসবাস করবার জন্য মত্ত হয়ে উঠেছে। এ-ছাড়া মানুষ নিজেদের জীবনধারাকেও সবদিক দিয়ে আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট। অজস্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অজস্র নতুন নামও আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে আমার তো মনে হয়, মানুষ ছেলেমেয়েদের বৈজ্ঞানিক নাম রাখতে শুরু করবে।

এ-যুগের বিজ্ঞানের সবচেয়ে চালু জিনিসগুলো হল—

Penicillin, Radio, Television, Telephone, Wireless, Telescope, Radar, Missile, Hydrogen, Atom, Sputnik, Rocket, ICBM ইত্যাদি। হয়ত বৈজ্ঞানিক শব্দজুড়ে ছেলেমেয়ের নাম রাখা হবে পেনিসিলিন ভূঁইয়া, রেডিও দাস, টেলিভিশন সরকার, ওয়্যারলেস মিয়া, রাডার শেখ, মিসাইল মজুমদার, হাইড্রোজেন রায়, স্পুটনিক প্রাং, এ্যাটম সেন, ব্যালাস্টিক কর, এমনি আরও কত কী!

আবদার রশীদ [১৯৩০ —]

সেকেন্ড হ্যান্ড

মতীনের বিয়েতে থাকতে পারি নি। বাইরে যেতে হয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। ফিরে এসেই ভাবলাম ওর বউকে দেখে আসা দরকার। আসাদ, খলিল, হাশমত সাহেব—কারো সঙ্গেই দেখা করি নি এখনো। মতীনকে ওর বউয়ের সম্বন্ধে একটা 'ইতিহাস' বানিয়ে বলার প্ল্যান করেছিলাম আমরা ক'জন। সেটা ওরা কাজে লাগিয়েছে কিনা কে জানে!

প্ল্যান করেছিলাম নেহাত দুঃখে। একটা অদ্ভুত ব্যারাম ছিল মতীনের। হ্যাঁ, ব্যারাম ছাড়া আর কি! না হলে ওরকম কেউ করতে পারে? দু-একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে।

মতীনের সঙ্গে আমার পরিচয় মুসলিম হলে থাকার সময় থেকে। তখন থেকেই একটু একটু করে ব্যারামটার পরিচয় পাই। সেদিন হঠাৎ কী কারণে হলের আলো নিভে গেল। আমি একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিলাম। মতীন বলল—'আমাকে একটা মোমবাতি দিতে পারিস্?' দিলাম একটা। দেশলাই জ্বেলে মোমবাতিটা ধরাতে গিয়ে বলে উঠল—'এঃ হেঃ! এটা তো চলবে না। আর আছে?'

আমি বললাম—'কেন? চলবে না কেন!'

—'এটা তো সেকেন্ড-হ্যান্ড। আগে জ্বালানো হয়েছে একবার! আর একটা থাকলে দে ভাই।'

আমার গা'টা জ্বলে উঠল। বললাম—'না, আর নেই।' মতীন তখন সেই পরীক্ষার রাত্রে পড়াশোনা রেখে চলল নবাবপুরে মোমবাতি আনতে। সে সময়ে নাবাবপুর ছাড়া ধারেকাছে আর কোথাও কোনো দোকানপাট ছিল না।

আর একবার। আমি কলকাতায় গেলাম। মতীন কী একটা বই আমাকে আনতে বলল। আসবার সময় আমি পথে সেই বইটা পড়তে পড়তে এলাম। বইটা এনে ওর হাতে দিয়ে বললাম—'ভারি চমৎকার রে বইটা।'

মতীন আমার দিকে চোখ গোল গোল করে তাকাল। বলল—'তুই পড়েছিস বইটা?'

'হ্যাঁ, না পড়েই বল্‌ছি নাকি?' আমি একটু বিরক্ত হই।

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে মতীন বইটা আমার সামনে ফেলে দিয়ে রেগে বলল—'নিয়ে যাও তোমার সেকেন্ড-হ্যান্ড বই। ওটা আমি পড়ব না।'

ওর বেয়াকুবি দেখে সেদিন আমার যা রাগ হয়েছিল! হাতাহাতি হয়ে যেত, ঐ লাশের সঙ্গে হাতাহাতি করার মতো আমার জোর ছিল না বলেই বেঁচে গেল কোনোরকমে।

এর অনেক পরে আর একদিন। এইতো ওর বিয়ের কয়েকদিন আগে। ওর বাসায় আমরা আড্ডা দিচ্ছি। খুব জমে উঠেছিল আড্ডাটা। মতীনের চাকর এসে নতুন একটা

সিগারেটের টিন হাশ্‌মত সাহেবের হাতে দিল। মতীনের তখন মুখ চলছে অনর্গল। হাশ্‌মত সাহেবের হাত থেকে টিন্‌টা নিয়ে আসাদ গল্পের ফোড়ন দিতে-দিতেই ঢাক্‌নি ঘুরিয়ে টিন্‌টা কেটে ফেলেছে। ফেলেই কিন্তু জিব্‌ কেটে আমার দিকে তাকিয়েছে, সেই মুহূর্তে মতীনেরও চোখ পড়েছে। পড়তেই মুখ বন্ধ। কেউ যেন ওর মুখে হাতচাপা দিয়েছে। আসাদ একটু লজ্জিত হয়েই টিন্‌টা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—'নাও ভাই, তুমিই আগে নাও। শেষে আবার বলবে.....'

কথাটা শেষ হতে পারল না। বোমার মতো ফেটে পড়ল নাদুসনুদুস মতীন। সিগারেটের টিনটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল—'কেন খুললি তুই? খাব না আমি তোর সেকেন্ড হ্যান্ড সিগারেট। যা।'

আসাদ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মতীনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দ্বিগুণ রেগে চিৎকার করে উঠল—'তুই শালা সেকেন্ড হ্যান্ড। তোর পয়সা দিয়ে সিগারেট এনেছিস্‌, না খাবি ফেলে দিগে যা। আমার সাথে চোখ রাঙাতে আসিস্‌?'

হাশমত সাহেব (হাশমত সাহেব যদিও আমাদেরই সহপাঠী বন্ধু, তবু তাকে আমরা 'হাশমত' না বলে 'হাশমত সাহেব' বলেই ডাকি এবং 'তুই' না বলে আপনি বলি) তাড়াতাড়ি উঠে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আসাদকে ঠাণ্ডা করলেন। আড্ডার সমস্ত রসটা কর্পূরের মতো উবে গেল।

আমাদের দলের খলিল রাগে না। ধীর মাথায় সে মতীনকে বোঝাতে লাগল—'সত্যি ভাই মতীন, এ তোমার ভারি অন্যায়। তোমার এ স্বভাবটা তো বদলানো দরকার। তোমার স্বভাবটাকে তুমি যুক্তি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করো। তোমার বিচারে তো দেখা যায় রিকশা-ট্যাক্সি-গাড়ি-ঘোড়া এমনকি তোমার অফিস পর্যন্ত সবই সেকেন্ড-হ্যান্ড! তবু এগুলোকে তো ত্যাগ করতে পার না! তবে মাঝে মাঝে এ-রকম উদ্ভট বেয়াক্কেলে কাণ্ড কেন করো বল দেখি?

মতীন বলে উঠল—'হাত্তোর যুক্তির ইয়ে করি! আমাকে আর তোর যুক্তি শেখাতে হবে না।'

তারপর একটু নরম হয়ে বলেছিল—'ওসব যুক্তিফুক্তির কথা নয়রে ভাই! এগুলি আমার কেন জানিনে ভালো লাগে না। তোরা বুঝতে পারবি না ঠিক।'

আসাদ বলল—আচ্ছা ধর্‌, তোর বিয়ের পর যদি জানতে পারিস তোর বউ আগে কারো সঙ্গে কোনো ঘটনা করেছে? তা'হলে কি বউটাকেও এই সিগারেটের টিনের মতো ছুড়ে ফেলবি?' বলে সিগারেটের টিনটা কুড়িয়ে এনে একটা সিগারেট ধরাল। মতীন ওর কথা শুনে হেসে ফেলল। পরিস্থিতিটাও অনেকখানি হাল্‌কা হয়ে এল। কিন্তু আগের মতো আর জম্‌ল না।

সেইদিনই বাইরে এসে হাশমত সাহেব বলেছিলেন—'ঠিক বলেছিস্‌ আসাদ। ওর বিয়েটা হয়ে যাক্‌, তারপর ওর বউ সম্বন্ধে একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। বেশির ভাগ মেয়েরই বিয়ের আগে একটা-না-একটা কাণ্ড থাকে।'

আসাদ বলে—'আর কিছু না-থাকলেই-বা কী! একটা ইতিহাস এমন বানাব!—দেখি তখন মত্‌নে শালা কী করে।'

আমরা সবাই সে প্রস্তাবে সায় দিলাম। যেমন করেই হোক, ওকে বিশ্বাস করাতে হবে যে ওর বউ—ও যাকে বলে সেকেন্ড হ্যান্ড—তাই।

মতীনের বাসার দিকে যেতে-যেতে সেই কথাগুলোই মনে পড়ছিল। ওর বাসায় গিয়ে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল একজন। বলল—'আসুন।' —মুখের দিকে তাকাতেই চম্‌কে

গেলাম। হ্যাঁ, মতীনের বউই। কিন্তু শুধু মতীনের বউই নয়। হাসি—হাসিনা! আমাকে ও-রকম বোকার মতো তাকিয়ে থাকতে দেখেই নাকি কে জানে, বলল—'বসুন। আপনার বন্ধু এখনই আসবে। —কেউ এলে বসাতে বলে গেছে।'

আমি কিন্তু তখন অন্য কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি—এই সেই হাসি! হাসি পেল আমার।

....অনেক দিন আগে—আমরা তখন দিনাজপুরে থাকি। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি আমি। আমাদের পাশের বাসায় এই হাসিরা একদিন এসে উঠল। তারপর যা প্রকৃতির নিয়ম তাই হল। চোখে চোখে তাকানো। দূর থেকে হাসি-বিনিময়। ক্রমে পত্র বিনিময়। তারপর একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি। আরও পরে একদিন বড় ভায়ের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। তিনি আর ওঝা ডাকলেন না। নিজেই ঝাড়লেন আমাকে। আমি যুগপৎ বিরহের এবং পিঠের জ্বালায় হাহুতাশ করতে করতে পড়াশুনায় মন দিলাম। তারপর একদিন হাসিরা বদলি হয়ে গেল। ধীরে ধীরে জুড়িয়ে অবশেষে ফুরিয়ে গেল সব।

তবে আসাদ, খলিল, হাশমত সাহেবরা খুশি হবে যদি ওদের জানাই যে, মতীনের বউয়ের রেডিমেড ইতিহাস আছে, অন্য কোনো ইতিহাস বানাতে হবে না।

এই সেই হাসি। তাকিয়ে দেখি তখনো হাসছে। আমি একটু ইতস্তত করে—'আচ্ছা আমি নাহয় পরে আসব। একটি বিশেষ কাজ আছে—' বলে সরে পড়বার মতলব করতেই ক্যাঁক্ করে পেছন থেকে ঘেঁটিটা ধরে কে বলে উঠল—'তোমার বিশেষ কাজের নিকুচি করেছি, হতভাগা! বিয়ের সময় আস নি, আবার এসেই পালানোর মতলব হচ্ছে।'

হাসি হাসতে হাসতে ভেতরে চলে গেল। আমি চুপ করে বসে রইলাম। মতীন আমার হাতটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল—'কি রে, কিছু বলছিস না যে! ঘোর লাগল নাকি আমার বউকে দেখে? আহা, তা লাগবার তো কথাই! পুরনো প্রেম উথলে উঠছে কিনা!' বলতে বলতে ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে লাগল।

আমি ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাতেই বলল—'ভাবছিস কী করে জানলাম, না? বউই বলেছে, মাইরি। আমাদের সেই গ্রুপ-ফটোটাতে তোর ছবিটা দেখে চিনতে পেরেছে। তারপর জিজ্ঞেস করতেই সব বলে দিয়েছে'—মতীনের কণ্ঠে রীতিমতো খুশির সুর।

তারপর, আমার বিব্রত ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে গেলে বললাম—'আচ্ছা, এখন তোর মনে হয় না বউটা সেকেন্ড হ্যান্ড?

—'ধূর গাড়োল কাঁহাকা।' বলে আমার পিঠে একটা থাবড়া মেরে ঘরের মধ্যে সিগারেট আনতে গেল। হাসি ততক্ষণে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। ভাবলাম মতীনের কাছ থেকে আমার প্রশ্নের উত্তরটা আর এখন পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে বউয়ের সামনেই ও আরম্ভ করল—'বুঝলি, যে-মেয়েকে দেখে কোনো ছেলে কোনোদিন প্রেমে পড়েনি, তার রূপই বা কী, আর তোর মতো একটা গুণী ছেলের প্রেমে যে-মেয়ে সাড়া দিতে না পারে, তার গুণই বা কী বল্?' বলে আড়চোখে বউয়ের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। এরপর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলে—'তাছাড়া আর একটা কথা কী জানিস্? যে-মেয়েরা বিয়ের আগে প্রেম করেনি, তারা নির্ঘাৎ বিয়ের পরে প্রেম করে। সেদিক দিয়েও বেঁচে গেছি।'

মমতাজউদ্‌দীন আহমদ [১৯৩৫ —]

মশা বাবাজি জিন্দাবাদ

আপনারা যে যাই বলুন, আমি আপনাদের মতের সঙ্গে একমত নই। একসময় আপনাদের সঙ্গে একমত ছিলাম কিন্তু বহুপ্রকার গবেষণা ও স্বপ্নদর্শনের পর আমার মত ভিন্ন হয়ে গেছে। এখন যদি আপনারা আমাকে আড়ালে বা প্রকাশ্যে দালাল বলে আখ্যায়িত করেন, আমি নাচার। আমার গবেষণা আমার থাক, আপনাদের মত আপনাদের থাক।

আপনারা মশার বিরুদ্ধে, আমি মশার পক্ষে। মশা আপনাদের জ্বালাতন করে, কামড়ায়, রক্ত শোষণ করে। তাতে আপনাদের শরীর এবং মন ছটফট করে। আপনারা মশার কামড়ের ঠেলায় লাফাতে লাফাতে ঘরের বাহিরে আসেন। আপনাদের মগজ গরম থাকে, জ্ঞান-বুদ্ধি অস্থির হয়, নিধনের জন্য আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে নাড়া দেন এবং আমাদের সুমহান পৌরসভার কার্যকরণকে চৌদ্দপুরুষের নাম ধরে লদ্ভির কাপড়-কাচা করেন। আপনাদের গলাবাজি শুনে শহরের ছাগল ও বক্‌রী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু আমি আপনাদের নাড়ার সঙ্গে নাড়া লাগাই না, আপনাদের মতো পরনের কাপড় ঢিল করে পৌরসভার চৌদ্দপুরুষের ধ্বংস ঘোষণা করি না। আমি নীরব থাকি এবং মনে-মনে আপনাদের ছোকরামি দেখে মিটির মিটির হাসি। হাসতে-হাসতে আমার দুইচক্ষু ধরে ঝিরঝির করে স্নেহরস ঝরে। আমি আপনাদের আহম্মকির জন্য পরম করুণাময়ের কাছে পানা চাহি।

আপনারা যে-কারণে মশার বংশের ধ্বংস চাহেন আমি সে-কারণেই মশার আবাদ চাহি। মশা যে কত দরকারি আলামত তা আপনাদের যদ্দিনে বুঝিয়ে দিতে না পারব ততদিন আমার কোনো বিশ্রাম নাই।

আপনারা বোধকরি খবর পেয়ে গেছেন, দুনিয়াতে ইতিমধ্যে আমাদের দেশের নাম খুব ভালোভাবে ফুটে গেছে। সকালের আলো পেয়ে সূর্যমুখী যেমন ফোটে, কুকুরের ডাক শুনে যেমন তস্করের কান ফোটে, ঘুসের টাকা দেখে যেমন অফিসারের মগজ ফোটে—তেমনভাবে দুনিয়াতে আমাদের দেশের নাম শতদল পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে। আর আমাদের কোনো ভাবনা নাই। আমাদের উন্নতি বা অবনতি যেভাবেই বলেন, ঠেকাবার কোনো পথ নাই। কোন্ দেশ বন্যার সময় সুন্দর হয়, কোন্ দেশে বেতনের টাকা দিয়ে তিন দিনের খোরাকি হয়, কোন্ দেশের ছাত্ররা পরীক্ষাতে পাস করে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়, কোন্ দেশের ঠ্যাঙ থেকে মাথা পর্যন্ত ঈমানের করগেটেড টিন দিয়ে ঢাকা, কোন্ দেশের গাই-গরু বালতি বালতি পানি দেয়? উত্তরের জন্য গগনবিদারী একটাই ধ্বনি উঠবে—সেই দেশের নাম বাংলাদেশ—মণিমুক্তার বাংলাদেশ।

এই মণিময়, খনিময় এবং তৈলময় বাংলাদেশের ঘরে-ঘরে হাজার-হাজার মশা উড়ে বেড়াচ্ছে, এই খবর যখন দুনিয়ার মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে যাবে তখন কী-যে এক মর্মান্তিক কাণ্ড হয়ে যাবে, আপনারা কেউ বুঝতে পারছেন না। বড়ই দুর্ভাগ্য, আপনাদের এখন পর্যন্ত কোনো আন্তর্জাতিক জ্ঞানলাভ হল না। আর এই আন্তর্জাতিক জ্ঞানের অভাবেই মহান বাংলার জাতিটি দিনকে-দিন পিছিয়ে পড়ছে। হায়রে মানবভাগ্য! নারে, আমার অস্থির মন, তুমি আর অধীর হয়ো না, তুমি আর কাউ-কাউ করো না। শান্ত হওরে মন আমার! রজনীগন্ধার সবুজ ডাঁটার মতো দণ্ডায়মান থাকোরে অবুঝ মন! একদিন তোমার সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াবে, একদিন তোমার ভাগ্যগগন ভেদ করবে, একদিন অবশ্যই তুমি দুনিয়ার সেরা নেশন হিশেবে জমিদারি লাভ করবে। —হ্যাঁ, আমি বলছি, তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে চলেছে। অতি শীঘ্র।

কী করে এই সুপ্রসন্ন ভাগ্যের কথা বললাম? বললাম এইজন্য যে, আমার হাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান। আর সেই প্রমাণ হল, বাংলাদেশের হাতে করুণাময়ের অশেষ মেহেরবানিতে এমন এক মাল এসে গেছে, যে মাল সউদের আরব থেকে লিঙ্কনের আমেরিকা, থ্যাচারের ইংলন্ড থেকে হিরোহিতোর জাপান কারো কাছে নাই। কী সেই মাল? সে মালের নক্সা কী? সে মালের মরতবা কী? সে মালের বাপের নাম কী?

সে মালের বাপ-মা, দাদা-দাদি চৌদ্দপুরুষের নাম হল মশা। ভালো বাংলায় মশক আর ইংরেজিতে মসকুইটো। খুব সংক্ষিপ্ত, খুব মজবুত, খুব খাঁটি একটি নিত্য সমাস—মশা। ম-এতে মঞ্জিরা, মানে বাঁশি বাজিয়ে যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ; শা-এতে শারীরিকভাবে মনুষ্য এবং অন্যান্য প্রাণীকে আনন্দ দানের চেষ্টা করে—তাই হল মশা। মশা আনন্দ দিতে চায়, কিন্তু মানুষ সে আনন্দ নেয় না। শরীরে ধূলাবালি, জামাকাপড়, গয়না-ঘড়ি থাকলে যে মানুষ সামান্য মশার তাড়নায় কেন যে বিড়বিড় করে তা যেমন মশা বোঝে না, তেমনি আমিও বুঝি না। যে জাতি মশার সামান্য কামড় সহ্য করতে চায় না, সে জাতি কোনোদিন উন্নত হতে পারবে না। মশার কামড় সহ্য করেছিল বলেই এককালে গ্রিস ও রোম বড় জাতি হয়েছিল। মশার কামড় খেয়ে শত-শত প্রবাসী মরতে শিখেছিল বলেই ম্যানহাটন আর নিউইয়র্ক শহর গড়ে উঠেছে। অথচ এদেশে সেরকম ত্যাগের সংবাদ নাই। মশার কামড় খেয়ে এ-দেশের মানুষের জ্বর হয়েছিল বলে এদেশেই জ্বরের ওষুধ প্রথম আবিষ্কার হয় আর তাতেই এদেশ ও এ-জাতি এত পিছিয়ে পড়ছে। অথচ মশার কামড় খেয়ে পাণ্ডুজ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, কাঁপানি জ্বর, পায়ের গোদ কতরকম অসুখ যে হয়েছে অন্যদেশের মানুষের, কত মানুষ যে ধুঁকে-ধুঁকে মরেছে কিন্তু তবু ওরা বাঁচার জন্য পাগল হয় নি, ওষুধ আবিষ্কার করতে হিমালয় পর্বতের গাছপালা উজাড় করে নি—সেইজন্যই সেসব কিউবা, স্পেন, আমেরিকা সবাই আজ কত উন্নত। ওদেশগুলোতে কত সব মজাদার আইসক্রিম ও বোমা পাওয়া যাচ্ছে।

আমি তো হলপ খেয়ে বলে দেব, মশা হত্যা করার জন্য মার্কিনদেশের কোনো পৌরসভার মেয়র সাহেবকে জনগণ যাচ্ছেতাইভাবে কোনোদিন ধমক দেয় নি। মেয়র সাহেব মশার বিষয়ে জনগণের কাছে কক্ষনো অপমানিত বা লাঞ্ছিত হন নি। সেরকম কোনো উদাহরণ নাই। একবার জার্মানদেশে ইঁদুরের উৎপাত হয়েছিল। হ্যামিলন শহর তাতে ডুবে যাচ্ছিল। মেয়র সাহেব এক বাঁশিওয়ালাকে অবশ্য ভোগা দিয়েছিলেন। কিন্তু মশার ব্যাপারে কোনোদিন কোনো শহরের মেয়র, কোনো বাঁশিওয়ালা অথবা বাঁশ-ওয়ালা কারো কাছেই কোনো ওয়াদা

করেন নি। কেন তিনি ওয়াদা করবেন? একটা শহরে যদি হাজার-হাজার মশা মনের আনন্দে গান গায়, যদি মশার পাল মানুষের রক্ত খেয়ে গোদ্দা হয়, মশার কামড় খেয়ে যদি কারো মুখচোখ লাল হয়, সেজন্য সে শহরের মাননীয় মেয়র সাহেব কিম্বা তাঁর অনুচরবৃন্দ কেন লাঠিসোটা নিয়ে মশা মারতে ছুটবেন? মেয়রের কাজ মেয়রগিরি করা, মশা মারা নয়।

মেয়র যদি মানুষ খুন করার অনুমতি না পান, তাহলে তিনি মশা মারার অনুমতি পেতে পারেন না। মানুষ যদি জাতির জন্য একটি আবশ্যকীয় এবং অনাবশ্যকীয় প্রাণী হয়, তাহলে মশাও সভ্যতা বিস্তারের জন্য অবশ্যই আবশ্যকীয় এবং অনাবশ্যকীয় পতঙ্গ নিশ্চয়।

বাংলাদেশে মশার বংশ দিনকে-দিন বাড়ছে। বেড়েই যাচ্ছে। কারণ আছে তাই বাড়ছে। আমাদের মহান দেশে প্রতিদিন প্রতিটি জিনিসের দাম ভয়াবহভাবে কমেই যাচ্ছে। আজ একটাকাতে এগার কেজি চাউল, কালকেই সেই একটাকাতে সতের কেজি চাউল। আজ দু'আনাতে তিন লিটার খাঁটি গরুর দুধ, আগামীকাল দু'আনাতে সেই দুধ চার লিটার। মানুষ সে ভয়ে জিনিস কিনতেই পারছে না। দেখা যাক জিনিসের দাম কমতে-কমতে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকে।

আমার এক বন্ধু এ ভয়ে গত দুবছর ধরে লুঙ্গিই কিনছে না। দাম কমতে কমতে এখন একটাতে চারটা খাঁটি একশ-একশ সুতার লুঙ্গি পাওয়া যাচ্ছে। আমার বন্ধুর ধারণা হয়েছে, একদিন-না-একদিন একটাকাতে দশটা লুঙ্গি পাওয়া যাবে। লুঙ্গির অভাবে আমার দোস্ত এখন লুঙ্গিহীন অবস্থায় ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় আর তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে লজ্জায় চোখ বন্ধ করে ঘরের মধ্যে হাঁটে। তবু লুঙ্গি কেনে না।

এই হয়েছে বিপদ। আমাদের সরকার যদি অনুগ্রহ করে একটা কড়া নির্দেশ দিয়ে দেয় যে, বাংলাদেশে কোনো জিনিসের দাম আর কমবে না, তাহলে জনগণ জিনিসপত্র কিনতে লাগবে। কিন্তু বাংলাদেশের জনপ্রিয় মহান সরকার এমনই বোবার ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় শুরু করেছে যে, জিনিসের দাম কমা কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। আর জনগণ জিনিসপত্র কিনতেও পারছে না। তাতে দেশে খাওয়া-দাওয়া, পরা-ধরা সব বন্ধ হয়ে গেছে।

আর মশার হয়েছে খুব মজা। জনগণ খালিগায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মশারা সেই খালি শরীর থেকে চোঁ-চোঁ করে রক্ত খেয়ে নিয়ে মোটা হচ্ছে। যত মোটা হচ্ছে ততই মশাদের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে আর ততই মশারা ডিম প্রসব করছে। মশার ডিম খাওয়ার জন্য কই মাছ দরকার। কিন্তু বন্যার পানি তাড়াবার জন্য সরকার কর্তৃক যে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তাতে খালে বিলে, হাটে-ঘাটে কোথাও পানি নাই। পানি না থাকলে কই মাছ নাই। কই যদি না থাকে তো মশার ডিম কে খায়? অতএব মশার বংশ বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। এখন আমাদের বাংলাদেশ হল মানুষের দেশ আর মশার দেশ। মানুষ আর মশা—মশা আর মানুষ।

তবে আমাদের দেশে মানুষের খুব দাম। আমাদের সরকার আর কিছু করুক আর নাই করুক, দেশের মানুষের খুব দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলার মানুষ দুনিয়ার যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই তাড়া খাচ্ছে—কী ব্যাপার? নারে বাপু, তুমি বাংলাদেশের মানুষ তোমার খুব দাম, তোমাকে আমাদের দেশে রাখা যাবে না—। তুমি যাও।

এভাবে ধাক্কা খেতে-খেতে বাংলার মানুষ আবার বাংলাতে ফিরে এসে গাড়ির ধাক্কা, রিকশার ধাক্কা, গরুর ধাক্কা, পুলিশের ধাক্কা, সর্বশেষ রেলগাড়ির ভমাভম ধাক্কা খেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ছে। বাংলার মানুষ শুয়েই পড়ছে।

মানুষ নাহয় মাটিতে শুয়ে থাকছে, কিন্তু বাংলার মশা তো শুয়ে থাকতে শেখে নি। বাংলার মশা তো শুধু উড়তেই জানে। উড়তে-উড়তে মশা এসে দেশবাসীর মোহনীয় শরীরে বসছে।

যেমনি চমৎকার মশারা বাংলার নধরকান্তি মনোহর মানব-মানবীর শরীরে উড়ে এসে বসছে, আর অমনি বাংলার সুখী মানুষরা হৈ-হৈ করে উঠছে। বাংলার মানুষ চিৎকার করে বলছে, তাড়াও তাড়াও, মশা তাড়াও। বাংলার মানব যত বলছে তার দ্বিগুণ বলছে মানবীরা। মানবীদের রক্ত ও শরীরের প্রতি মশাদের নাকি বেশি আগ্রহ, বেশি প্রেম।

আমার কিন্তু এ-সব হৈ-হৈ মোটেই ভালো লাগছে না। বাংলার এত মূল্যবান মাল মশাকে তাড়াবার জন্য মানব-মানবীরা যতই ফাল দিক, আমি একজন সাচ্চা নাগরিক এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন প্রজা হিশেবে মাননীয় জনকল্যাণমূলক বাংলার সরকারকে অতি বিনীতভাবে আব্দার করে বলছি, হুজুর বাহাদুর সরকার আপনারা কিছুতেই বাংলার মানুষের কথায় ভুলবেন না। বাংলার মশাকে কিছুতেই মারবেন না, এমনকি ধমকও দেবেন না। কেবল জামাই-এর আদরে মশাকে পুষবেন। মশার মতো সম্পদ থাকলে বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অল্পদিনের মধ্যেই পাল্টে যাবে। মশা আমাদের জাতীয় সম্পদ, মশা আমাদের হার্ড কারেন্সি। মশাই আমাদের ডলার, মশাই আমাদের ইয়েন, মশাই আমাদের সোনা, আমাদের পেট্রোল। সরকারের উচিত মশা নামক এই জাতীয় সম্পদকে আর পৌরসভার হাতে ফেলে না-রেখে মশার জন্য একটা স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় স্থাপন করা। মশার চালান করে প্রতিবছর যে বিদেশি মুদ্রা অর্জন হবে, তাতেই ঢাকা শহরের উপরে একটা এবং ঢাকার মাটির নিচে আর একটা ঢাকা তৈরি করা যাবে।

এবার গবেষণা ও স্বপ্নদর্শনের গুণে যা আমি পেয়েছি, তাই এক-এক করে বয়ান করছি। সবই মশা বিষয়ক—

১. বর্তমান পৃথিবীর কোনো দেশে আর মশা নাই, কেবল বাংলাদেশেই মশা পাওয়া যায়। পৃথিবীর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মশা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হবে। অতএব পৃথিবীর সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র পাঁচটি করে মশা নমুনা হিশেবে পাঠাতে গেলেও কয়েক কোটি মশা দরকার হবে।

২. বিদেশে পাঁচটা-পাঁচটা করে মশা পাঠাতে হলে সহস্র-সহস্র ছোট বাক্স তৈরি করতে হবে। সেই ফ্যাক্টরিতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

৩. মশাকে জীবন্ত অবস্থায় পাঠাতে হলে অপরিমিত অক্সিজেন দরকার। অতএব অক্সিজেনের পাইপ তৈরি করা প্রয়োজন। তাতেও ফ্যাক্টরি এবং মানুষকে কাজে লাগাতে হবে।

৪. মশাসহ মশার বাক্স যত্ন করে প্যাকিং করার জন্য পেরেক ও হাতুড়ি দরকার। তাতে আবার ফ্যাক্টরি, আবার শ্রমিক দরকার। অতএব বেকার সমস্যা সমাধান হতে যাচ্ছে।

৫. মশার বাক্স কীভাবে বিদেশে যাবে? জাহাজ ভাড়া করতে হবে। অতএব জাহাজ তৈরি করতে হবে। শিপিং করপোরেশন, শিপিং লাইন ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা এসে গেল। অতএব বাঙালি হাস্য করুক।

৬. মশার বিষয় জ্ঞান বিতরণের জন্য পণ্ডিত ও ভুক্তভোগী ব্যক্তির দরকার। অতএব বাংলার মশা-অধ্যাপক ও মশা-রোগীরা দলে দলে বিদেশে যাবে। খুব মজা। লোকসংখ্যা কমতে শুরু করবে।

৭. মশার জন্য অর্জিত বিদেশি মুদ্রার হিসাবপত্র রাখার জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে, তাতেও বহু হিসাববিদের কর্মসংস্থান হয়ে যাচ্ছে। বাহবা কী সুখের খবর ! মশা দীর্ঘজীবী হও !

৮. মশাকে যেন কেউ না মারে, মশার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ভাঙা টিনের বা মাটির হাঁড়ি রাখা হয় তা দেখার জন্য পুলিশ অথবা সশস্ত্রবাহিনী নিয়োগ করতে হবে। তাতেও বহু বাঙালির চাকরি হয়ে গেল। মশা তুমি দলে-দলে এস ভাই।

এ তো গেল বিদেশে মশা চালান দেয়ার বিষয়। এখন আসি দেশের ভেতরের বিষয় নিয়ে। বাঙালি যদি সমস্ত মশা বিদেশে পাঠিয়ে দেয় তাহলে বাংলার পরিমণ্ডলে মশার অভাব ঘটে যাবে। তাতে প্রকৃতির আবহাওয়ার মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হবে। অতএব দেশের মধ্যে মশার সংখ্যার ঘাটতি করা যাবে না। মশার আবাদ চলতেই থাকবে।

এবার কী কী উপায়ে মশার আবাদ বৃদ্ধি করা যায় তার একটা গবেষণা এবং স্বপ্নদর্শন আমি করেছি। নিচে তারই নমুনা দিয়ে রাখি :

১. বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে রাস্তাঘাটের আনাচে-কানাচে ময়লা আবর্জনা দিনরাত ফেলে রাখতে হবে। এসব জায়গায় মশা ডিম দেবে।

২. প্রত্যেক বাড়ির কোণায় কোণায় ভাঙা গামলাতে পানি রাখতে হবে। মশা মনের আনন্দে ডিম দেবে।

৩. শোবার ঘরের খাটের নিচে ছোট পুকুর কেটে রাখতে হবে। মশারা তাতে এসে বসবে, ঘুমাবে, গান গাইবে এবং প্রেমালাপ করবে।

৪. মশাকে রক্ত সরবরাহ করার জন্য প্রত্যেক পুরুষ নাগরিককে প্রতি সন্ধ্যায় একঘণ্টা খালি গায়ে বসে থাকতে হবে। মশা সেই খালি শরীরে বসে মনের সুখে রক্ত পান করবে। আর মহিলাদেরকে প্রতিরাত্রে মশারি না-টাঙিয়ে দু-ঘণ্টা শুয়ে থাকতে হবে । মশারা মহিলাদের রক্ত খেয়ে বেশি সুখ পায়।

আরো অনেক উপায় করে মশার আবাদ বৃদ্ধি করা যাবে। যদি মাননীয় সরকার আমার কাছে আন্তরিকভাবে গবেষণাটি সম্পর্কে জানতে চায়, আমি তা জানাব। দেশের উন্নতির জন্য কাজ করাতে আমার আনন্দ। তা ছাড়া আমি সবসময় সরকারপক্ষের লোক। আমি খাঁটি দেশপ্রেমিক। জাতীয় পর্যায়ে একটা কথা বার-বার করে প্রচার করতে হবে যে, মশা বাংলাদেশের জন্য এক অতি মূল্যবান সম্পদ। মশা আছে বলেই বাংলাদেশের সুনাম পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। মশার উপকারিতা সম্পর্কে এখন দু-চারটি কথা বলে নিই :

১. মশা গুনগুন গান করে আমাদের একাকীত্ব দূর করে।

২. মশার কামড়ে জ্বর হয়। জ্বর হলে শরীরে কম্পন হয়। কম্পন হলে শরীরের ব্যায়াম হয়। ব্যায়াম দ্বারা শরীর তাজা থাকে।

৩. মশা থাকলে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া কম হয়। মশার কামড়ের ভয়ে স্বামী বা স্ত্রী বেশিক্ষণ মশারির বাইরে থাকতে পারে না। অতএব তাড়াতাড়ি মশারির নিচে আশ্রয় গ্রহণ এবং নিদ্রার আগমন। সংসার সুখের হয় মশার গুণে।

৪. জনপ্রিয় সরকারকে যখন কোনো বিষয়ে গালাগালি দেয়া সম্ভব হয় না, তখন মশার আক্রমণের বিরুদ্ধে বিরোধীদলের জাগরণ। গণতন্ত্রের জয়জয়কার। মশা মানেই গণতন্ত্রের জয়।

৫. বাড়ির চারদিকে মশার উৎপাত থাকলে চোরের উৎপাত থাকে না। চোর মশার কামড়ের জ্বালায় শিক খুলে ফেলার কৌশল ভুলে যায়।

৬. মশা থাকলে খাদ্যসমস্যার সমাধান হয়। মশাকে তাড়াবার জন্য বাঙালি ব্যস্ত থাকে, পেট ভরে ভাত খেতে পারে না। অতএব চাল কম খরচ হয়।

৭. মশা বড় সাহেবের গালে বসেছে। এই অজুহাতে বড় সাহেবের গালে চড় মেরে মনের ঝাল এবং বিপ্লবের জ্বালা মেটানো যায়।

মশার এত উপকারিতা আছে বলেই আমাদের ঢাকা শহরে মশানিধনের কোনো প্রচেষ্টা নেয়া উচিত নয়। জাতির মনোবলকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য এবং এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বাংলার ঘরে-ঘরে মশারক্ষার দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। দুর্গের জন্য আলাদা ট্যাক্স দিতে সকলকে বাধ্য করতে হবে।

আমি অত্যন্ত খুশি যে, আমাদের শহরের পৌর কর্তৃপক্ষ এবং সরকার আমার মশা-বিষয়ক গবেষণা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেই এখন পর্যন্ত মশার বিরুদ্ধে কোনো অভিযান গ্রহণ করছে না। এই নীরব ও নিশ্চেষ্টতা সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক। সমস্ত পৃথিবী আমাদের পৌরসভা ও সরকারের এই গভীর সাধনা দেখে বিস্মিত হয়ে গেছে। মনে হয় প্রতিদিন হাজার হাজার অভিনন্দনের টেলিগ্রাম আসছে। অতি আনন্দের সঙ্গে এও আশা করা যেতে পারে, বাংলাদেশকে মশা সংরক্ষণের জন্য শীঘ্রই জাতিসংঘ পতঙ্গকল্যাণ মেডেল দেবে। আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বিশেষ বিমানযোগে সেই মেডেল আনতে যাবেন। আমরা মোড়ে-মোড়ে হাজারখানেক তোরণ তৈরি করে মেডেল লাভের উৎসব করব। প্রতিনিধির গলায় হাজার হাজার মালা দেব।

মশা সম্পর্কে আমার সর্বশেষ ধারণার কথা বলে আমি এই ক্ষুদ্র রচনা শেষ করব। মশা যদিও ছোট কিন্তু খুব শক্তিমান। তার বহু প্রমাণ আছে। আমাদের নেতারা আমাদের জনগণকে হাতি ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। হাতি খায় বেশি কিন্তু কাজ করে না। হাতি দেখতে কুৎসিত আবার বাঁচেও বেশিদিন। এই হাতি নামক জনগণকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য মশা হল শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

এক রাজার এক হাতি ছিল। সে হাতির খুব অহঙ্কার। রাজাকে দেখলেই হাতি খেপে যায়। রাজা বলল, থামরে হাতি, তোকে আমি জব্দ করব। এই-না বলে রাজা ক্ষুদ্র প্রাণী মশাকে ডেকে বলল, ওরে মশা তুই হাতিকে জব্দ কর। মশা গুনগুন করে উঠল। রাজার কথা শুনে মশারা মহাখুশি। করল কী, শাঁ শাঁ করে উড়ে এসে মস্ত হাতির দুই কানের মধ্যে ঢুকে গেল। মশা এবং তার সুন্দর বউ। এককানে স্বামী-মশা আর-এককানে স্ত্রী-মশা ঢুকে গিয়ে দিনে-রাতে তিনবার গুনগুন করে বক্তৃতা করতে শুরু করে দিল। হাতি তো পড়ল মহা ঝঞ্ঝাটে। এত বক্তৃতা শোনার ইচ্ছা তার নেই। কিন্তু স্বামী আর স্ত্রী বক্তৃতা শোনাবেই শোনাবে।—গাছের কথা, দুধের কথা, গাঁজার কথা, ঘাসের কথা, জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা, ছাগলের কথা—

সবরকম কথার বক্তৃতা করে-করে হাতিকে দিল অবশ করে। হাতি এখন রাগও করে না, দুঃখও করে না। শেষে অতবড় হাতিটা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে দুর্বল হতে-হতে একদিন মাটিতে পড়ে গেল। হাতির শরীর আর চলে না। হাতি বুঝি মরে যাবে।—

হাতি মরে গেলে রাজার মনে খুব সুখ হয়। প্রজা যদি নীরব থাকে শাসক তো খুশি হবেই।

আমাদের জনপ্রিয় সরকার মনে হয় এই হাতি আর মশার কথাটা জানে। সেজন্য মশার গান হাতিকে শোনাবার জন্য, মশা মারার জন্য ধোঁয়া কি কামান কিছুই ছাড়ছে না আমাদের সরকার। যদিও আমাদের পৌরসভার হাতে বহু কামান আছে। কিন্তু মশা মারার জন্য কামান ছাড়ার কোনো উদ্‌যোগ নাই। —একদিন না একদিন জনতা-রূপ হাতিটা দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন সেই কামান বেঁচে যাবে। এইতো জাতীয় উন্নতির সর্বোত্তম পলিসি।

আমি সরকারকে কাতরস্বরে যে আবেদনটা জানাতে চাইছি তা হল—আমাদের দেশের অকৃতজ্ঞ জনগণকে আর বেশি প্রশ্রয় দেয়া ঠিক হবে না। এ জনগণকে কঠিনভাবে কষ্ট দিয়ে দিয়ে রুদ্ধ করে রাখতে হবে। বাংলার অবিবেচক জনগণকে রুদ্ধ রাখার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক :

১. আমাদের খাবার-দাবারের দাম খুব কম। কম-দাম রাখা চলবে না। অনতিবিলম্বে খাবার-দাবারের দাম কমপক্ষে দশগুণ বৃদ্ধি করে দিতে হবে। একশ বাইশ টাকার নিচে কিছুতেই পাওয়া যাবে না।

২. এদেশে খুব সহজে ওষুধ পাওয়া যায়। এখন থেকে ওষুধ পাওয়া খুব কঠিন হবে। জ্বরের জন্য একটি বড়ির দাম হবে আড়াইশ' টাকা। জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে কত ধানে কত চাল—।

আমাদের সরকার যদি এভাবে চলতে এবং চালাতে পারেন, তাহলে এদেশের মানুষের মন খুব শক্ত হবে। হাজারটা কেন, একলক্ষ মশা কামড় দিলেও তখন বাংলার মানুষ আর হৈ-চৈ করবে না। মশার কামড় খেয়ে যে-জাতি মরেছে, সে-জাতিই পৃথিবীতে খুব বড় জাতি হয়েছে।

আগে বাংলার মানুষ মশার কামড়ে হাসতে-হাসতে পটাপট মরতে শিখুক, তবেই বাংলা বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করবে। আমেরিকা, জাপান এভাবেই বড় হয়েছে। অতএব বাংলাকেও মশার কামড় খেয়ে বড় হতে হবে। হতেই হবে। অন্যথা নেই। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, বাংলার মানুষকে বিশ্বের দরবারে সমুন্নত করার জন্য আমাদের জনগণের নেতারা উঠে-পড়ে লেগে গেছেন।

বাংলার গাছ, পানি, মাছ, ছাগল সবকিছু সাফ করা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু একই সঙ্গে এদেশে মহামূল্যবান মশাকে সাফ না আবাদ করার কাজ চালু হয়েছে। বড় চমৎকার কাজ হচ্ছে। বড় মজাদার কাজ চলছে।—মশাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। বাংলার সব শেষ হয়ে যাক, কেবল মশা থাকুক। এবার বাংলার উন্নতি ঠেকায় কে। মশার দৌলতে বাংলা আগামী দুই বছরের মধ্যে এমন জাগা জাগতে যাচ্ছে যে, জগৎ সংসার জয়ধ্বনি করার জন্য জবর জঙ্গী বিমান নিয়ে জংশনে জংশনে দাঁড়িয়ে থাকবে। অতএব, মশা তোমায় জিন্দাবাদ।—

মশা তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সঙ্গে। আমরা, পৌরসভা ও সরকার যে মশার সঙ্গে আছে সে মশাকে কে ধ্বংস করবে? জনগণ করবে? জনগণ আবার কে?

জনগণের কী শক্তি? মশা তো জনগণকে চায় না। মশা চায় সরকারি আশীর্বাদ। বাংলার মশা ঠিক পথ ধরেছে। আশীর্বাদপুষ্ট বাংলার মশা জিন্দাবাদ।

খোন্দকার আলী আশরাফ [১৯৩৬ —]

ঘটক চলিল, চলিল

আমাকে আমি প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম জীবনের সেই সুবে সাদেকে। গতরে হাফপ্যান্টের আমল শেষ হয় নি, সেই তখন।

গুনাইসুন্দরী যাত্রা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানেই দেখা পেলাম আমার মানে ঘটকের। *আমরা যারা ঘটকালি করি, নরনারীর নিকে দিই, মিলন ঘটাই, ঘর বেঁধে দিই, একজন পুং আর একজন স্ত্রীংকে সংসার নামক স্বর্গের সিংহদ্বার চিনিয়ে দিই, কন্যাদায়গ্রস্ত আব্বার মুখে হাসি ফোটাই*—সেই ঘটকদের একজনের সঙ্গে।

রংমাখা বিতিকিচ্ছিরি চেহারার যাত্রাদলের সখীরা প্রবল বিক্রমে মানে লম্ফঝম্পসহকারে ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে গান গাইছিল—ও ঘটক চলিল, চলিল খালেক মিয়ার বাড়ি। একজন অস্থায়ী গাইছে আর অন্যরা দোহারকি দিচ্ছে। আহা সে কী অপরূপ সঙ্গীত লহরি ! যেন ঠাঠা পড়ছে একটার পর একটা।

তা সত্ত্বেও আজ এত বছর পরে নিজের সঙ্গে মোলাকাতের সেই মুহূর্তটির কথা ভুলতে পারি না। গানের অস্থায়ীটি স্থায়ীভাবে আস্তানা পেতে রেখেছে আমার হৃদয়-তালুকে। কেন রেখেছে এর কারণ যদি কেউ আমাকে শুধোয়, তাহলে জবাব দেয়া ভারি ঝকমারির ব্যাপার হবে। আমি এখন ঘটক বলেই গানের কলিটি আমার হৃদয় হরণ করেছিল—এই জবাব হয়ত দেয়া চলে। কিন্তু সমস্যাটি হল, তখনো তো আমি ঘটকালির ব্যবসা ধরি নি। এমনকি তখন আমাকে উদীয়মান ঘটক বলাও সম্ভব ছিল না। তাই ঐ জবাবটা বোধ হয় মিথ্যেই।

আসলে কী জানেন, সে আমলে গৈগেরামে গুনাইবিবির পালা দারুণ পপুলার যাত্রাগান ছিল। যাত্রার মরশুম শুরু হলেই ফি-রাতে কোথাও-না-কোথাও গুনাইসুন্দরী অথবা ভাসান যাত্রার আসর বসত। আর তখন লোকের মুখে-মুখে ফিরত—ও ঘটক চলিল, চলিল.....।

মনে রাখার আর-একটি কারণ ছিল—ঘটকের বিচিত্র ভূষণ (সে-কথা ভাবলে এখনো আমার পিত্তি জ্বলে যায়, খুনোখুনি করতে ইচ্ছে হয় যাত্রার লোকদের। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেদিনের আসরের অভিনেতা-অভিনেত্রী, অধিকারী, সখী, বাজনদার, ভলান্টিয়ার এদের কেউই বোধ হয় এখন বেঁচে নেই।)। তার অঙ্গে ছিল তালিমারা ময়লা গেঞ্জি। ঘাড়ের ওপর গামছা। চিবুকে একগুচ্ছ ছাগুলে নূর। মাথায় লেজবিশিষ্ট ফেজ। তার তলদেশ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে কাঁচাপাকা বাবরি। পরনে ফুলপ্যান্ট। তবে তার একটা পায়া হাঁটু পর্যন্ত। অন্যটা গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত হতেও পারে। কিন্তু তা বুঝবার উপায় নেই, কেননা হাঁটুর একটু নিচ থেকেই ঠ্যাংঙের ওপর দখলিস্বত্ব কায়েম করে রেখেছে সবুজ মোজা। একপায়ে অধুনালুপ্ত টায়ারের স্যান্ডেল। অন্য পায়ে ছেঁড়া বুট। তার ভেতর দিয়ে যুগপৎ উঁকি দিচ্ছে গোড়ালি ও আঙুল। বগলে ভিবজিওর ছাতা, হাতে বাগদি-বাড়ি থেকে ধার করা বাঁশের শক্তপোক্ত লাঠি।

বলতে ভুলে গেছি, গেঞ্জির ওপর একটা টাই দুলছিল। প্যান্টটা কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর ঘটক বাবাজির ছিল ইয়া লম্বা প্রায় দেড়-বিঘৎ দীর্ঘ জুলপি। বোধহয় এ-রকম জুলপি দেখেই বনফুল লিখেছিলেন, কী এমন বাহাদুর তুই— জুলপি রেখেছিস হাত দুই!

আমাকে বলা উচিত, আমার সেই পূর্বসূরীর এই বিচিত্র বেশ দেখে তো আমার চোখ রীতিমতো ছানাবড়া হয়ে গেছিল। অথচ মাত্তর কয়েকদিন আগে আমার মেজো মামুর শাদির পয়গাম নিয়ে যে-ঘটক এসেছিল, তাঁর সঙ্গে গুনাইসুন্দরী পালাগানের ঘটক চরিত্রের চেহারা সুরত কিংবা সাজসজ্জার এতটুকু মিল নেই। লোকটাকে নিয়ে যে মশকরা করা হচ্ছে, অকালপক্ব না হয়েও তা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম এবং দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। আরও বেদনার্ত হয়েছিলাম বিশেষ করে এই কারণে যে, ঘটক হিসাবে অমন সঙ সেজে যে-লোকটি মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন আমার জানের দোস্ত বলাই সাহার মামা মংলা পোদ্দার। তবে হ্যাঁ, মামার এ-অপূর্ব ভূষণ দেখে বলাই আর আমি হেসে গড়িয়ে পড়েছিলাম। রোমাঞ্চিতও হয়েছিলাম। আমার দোস্তের মামা এখন একজন জবরদস্ত অভিনেতা, এই নবলব্ধ জ্ঞান আমাকে রীতিমতো শিহরিত করেছিল। আসরে দাঁড়িয়ে পাঠ বলা তো আর ইয়ার্কি নয়, চাট্টিখানি কথাও নয়। গর্বে কেবল বলাই-ই নয়, আমার বুকও স্ফীত হয়ে গিয়েছিল।

ঘটকবাবাজির অভিনয় দেখে আমার তো তাক লেগে গিয়েছিল। ও ঘটক চলিল, চলিল খালেক মিয়ার বাড়ি .....এই সঙ্গীতের তালে-তালে ঘটক মঞ্চের ওপর দাপাদাপি করে একাকার করে ফেলল। সে কী হাততালি। খালেক মিয়ার বাড়িতে শাদির পয়গাম নিয়ে যাওয়ার অভিযান যে সার্থক হবে, সে সম্পর্কে মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না।

সবচেয়ে বেশি তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম—নিজ নর্তন-কুর্দনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার ছাতি আর লাঠি ঘোরাবার অপূর্ব কৌশল দেখে। পেনো (পানের দোকানদার) মংলা যে এমন প্রলয়ঙ্করী প্রতিভা, তার ভাগ্নে বলাই আগে তা ঘুণাক্ষরেও আমাকে জানায় নি বলে হৃদয়ে বেশ ব্যথা অনুভব করেছিলাম। আরও অনেক বছর পরে ঢাকায় 'নকশী কাঁথার মাঠ' নৃত্যনাট্যেও ঘটকের অঙ্গে ঐরকম বিচিত্র বেশ দেখেছিলাম। ঘটকদের কেন এমন বিতিকিচ্ছিরিভাবে সাজানো হয়, সে-সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের থিওরি হল : যারা ঘটকালিতে আস্থাভাজন নয় বা ঘটকদের মাধ্যমে বিয়ের চেষ্টা করে যারা ব্যর্থ হয়েছে, সেই হতাশ ব্যক্তিরাই তাদের গোস্সা চরিতার্থ করার নির্লজ্জ বাসনায় ওদের এমনভাবে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়। অবশ্য অপর কয়েকজন বিশেষজ্ঞের ধারণা এই যে : একদা যারা ঘটক হিসেবে ব্যর্থ হয়ে, এখন যাত্রা-নাটক ইত্যাদিতে ব্যাকডোর দিয়ে ঢুকে পড়েছে, তারাই প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ঘটকদের খাটো করে দেখাবার ঘৃণ্য অপপ্রয়াসে লিপ্ত। তাদের চক্রান্তেই আজ আমরা যাত্রা-থিয়েটারে কিংবা ঢাকাইয়া বায়োস্কোপে ঘটকদের অমন ভাঁড়রূপে আবির্ভূত হতে দেখি।

সত্য কথা বলতে কী, আজ যে আমি সহজ পন্থায় কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা বানাবার পেশা— যেমন ব্রিফকেস ব্যবসা, ছিনতাই, নেতাগিরি বা নারী অপহরণের মতো চাঞ্চল্যকর পেশার কুহকজাল ছিন্ন করে ঘটকালির পেশায় যোগ দিয়েছি, সেটা কেবল এর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিদের আচ্ছা করে টিট করার জন্যেই।

ঘটকালির পেশা আজ পেশা হিসেবে ম্রিয়মাণ। এই বিস্মৃত-প্রায় বৃত্তিতে আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। এই পেশার মহত্ত্বকে আবার বিকশিত করে তুলব আমি। এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করব যাতে এদেশের মানুষ মন্ত্রিত্ব অপেক্ষা ঘটকালিকেই অধিকতর পছন্দ করে, এমনকি মন্ত্রিত্বের জিঞ্জির ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই পেশায়। এই মহান লক্ষ্যে শিগগিরই আমরা স্কুল খুলছি ঘটকালি শিক্ষার।

তবে কী জানেন, অধিকাংশ মানুষই কখনো-না-কখনো ঘটকালি করে। আমাদের এই দেশে যেখানে কবিতা গল্প উপন্যাসে নাটকে রেডিও টিভিতে প্রেমের নিশান পতপত করে উড়ছে, সেখানেও ঘটকদের আধিপত্য স্বীকার করে নিতে হয়। তরুণ-তরুণীরা যখন প্রেমট্রেম করে, তখনো শাদির পয়গাম নিয়ে নিজেরা তেমন দৌড়াদৌড়ি করে না। তখন ঘটকের দরকার পড়ে। আত্মীয়-বন্ধুদের পাঠানো হয় পয়গাম দিয়ে। তারা যে-কাজটা করেন, সেটাকে তো ঘটকালিই বলে। তাই না কি?

আমরা অবশ্য এ-রকম অস্থায়ী কিংবা শৌখিন ঘটক বানাতে চাই না, চাই পেশাদার ঘটক নির্মাণ করতে। বিয়ের বিনিময়ে চাই রুটিরুজি, দূর অতীত থেকে মনীশ ঘটক কিংবা ঋত্বিক ঘটকের পূর্বপুরুষরা যা করে আসছিলেন। কেন যে ওদের দু-জনের আর তাদের সঙ্গে আরও অনেকের পেশাচ্যুতি ঘটেছিল, আমরা তা জানি না। তবে এই পদস্খলন নিঃসন্দেহে শোকাবহ। এদের অনাচারের ফলেই বিলুপ্ত হতে চলেছে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন এই ইনস্টিটিউশন।

হালে আমরা একটু বিপদে পড়ে গেছি প্রস্তাবিত ঘটক নির্মাণ স্কুলের শিক্ষক অন্বেষণ করতে গিয়ে। 'দক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন' শিরোনামায় আমরা যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, তার জবাবে কাঁড়ি-কাঁড়ি দরখাস্ত পেয়েছি। তাদের অনেককে নিয়োগও করেছি। কিন্তু উপযুক্ত প্রিন্সিপ্যাল জোটাতে পারছিনে। এর জন্য দরকার একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ঘটক।

সম্প্রতি ঐ পদের জন্য ঘটকালিতে অতি-সিদ্ধহস্ত একজন প্রার্থীকে পেয়েছিলামও। ভদ্রলোকের নাম বদনা মণ্ডল। কিন্তু ইন্টারভিউতে তিনি টিকতে পারলেন না। একটা মারাত্মক ত্রুটি ধরা পড়ে গেল তার। ইন্টারভিউতে আমাদের সাথে তার নিম্নবর্ণিত বাণী বিনিময় হয়েছিল।

আমি : মোট কতগুলো বিয়েতে আপনি সাফল্যের সঙ্গে ঘটকালি করেছেন?

বদনা : ১৩ হাজার ১৩ শত সাড়ে ১৩টি।

আমি : সাড়ে তের কী রকম?

বদনা : মানে একটা বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পাকা কথাও হয়েছে। পানচিনি আর কী। তবে এখনো কলেমা পড়া হয় নি। তাই ওটাকে পুরো বিয়ে না ধরে আধখানা ধরছি।

আমি : আপনি কি সবরকম ছেলের ও সবরকম মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন?

বদনা : অবশ্যই। কানা ছেলে, কালা ছেলে, কালো ছেলে, ন্যাংড়া মেয়ে, অন্ধ মেয়ে, নুলো মেয়ে সবরকম ছেলেমেয়ে পার হয়েছে আমার হাতে। আর কী জানেন, ওরা সবাই দারুণ সুখী। এখনো ওরা আমাকে দাওয়াত করে খাওয়ায়।

আমি : এই পেশার বৈশিষ্ট্য কি?

বদনা : একটু বেশি-বেশি মিথ্যে কথা বলতে হয় এই আর কি। তবে কী জানেন, এই বিশ্ব-সংসারে ঘটকালির চাইতে মহান পেশা আর নাই। কন্যাদায়গ্রস্ত মাতা-পিতাকে তো আমরাই আত্মহত্যার দায় থেকে রক্ষা করি। তাদের জান বাঁচাই মান বাঁচাই। জাতি-দেশ, মা-বাপ, তরুণ-তরুণী সকলেরই সেবা করি। বললামই নাহয় সেজন্য একটু বেশি-বেশি মিথ্যা কথা। ঐ যে বলে না, এন্ড জাস্টিফাইজ মিন্স।

আমি : এই পেশার জন্য আপনাকে কি কোনো বিপদে পড়তে হয়েছিল?

বদনা : অনেকবার। একবারের কথা বলি। আমাদের কাল্লু ফকির যখন পাঁচনম্বর বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আমিই তার ঘটকালি করেছিলাম। সব ঠিকঠাক। গোটা ব্যাপারটাই গোপনে সারতে চেয়েছিল কাল্লু।

বিয়ে পড়ানো হবে। কাজি সাহেব এসে গেছেন। এমন সময়—। হারে রে রে রে রে, ঐ যে কারা আসতেছে হাঁক ছেড়ে। বুঝলাম কাল্লুর চারবিবি তেইশ ছেলেমেয়ে আর সাতান্নজন নাতী-নাতিনী সবাই ধেয়ে আসছে। পালাতে হবে। নাহলে হাটুরে কিল খেয়ে অক্কা পেতে হবে।

কিন্তু সে মওকা পেলাম না। কে যেন আমার ঘাড় চেপে ধরে বলল, এই যে ঘটক। আসল হারামী তো এটাই। আরও একজন বলল, 'ধর শালাকে'। তারপর আরকিছু মনে নেই। কয়েক দিন পর জ্ঞান ফিরতে দেখি আমি হাসপাতালে। সারা-গায়ে ব্যান্ডেজ। এ-রকম আরও কয়েকবার হয়েছে।

আমি : তা জনাব মণ্ডল, আপনার নিজের বউ বিবি, ছেলেমেয়ে, নাতী-নাতনী কটা?

মণ্ডল সাহেব জবাব দিলেন না। মনে হল, উনি পোলাপান আর নাতী-নাতনীর সংখ্যা গুনছিলেন। বৌদের সংখ্যা গুনছিলেন। বৌয়ের সংখ্যাও গণবার দরকার হতে পারে।

আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার প্রশ্ন করলাম। মণ্ডল সাহেব তবু চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, কী হল উত্তর দিচ্ছেন না যে?

'সত্যি কথা বলতে কী', মণ্ডল সাহেব বিরস বদনে বললেন, 'আমি তো ইয়ে, মানে বিয়েই করি নি'।

'বিয়ে করেন নি?' পরম বিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করলাম, '১৩ হাজার ১৩ শত সাড়ে ১৩টি বিয়ে দিয়েছেন। আর নিজে একটাও বিয়ে করেননি? ইয়ার্কি পেয়েছেন বুঢ়া মিয়া? মনে করেছেন আপনি বললেই আমি বিশ্বাস করব?'

মণ্ডল সাহেব ম্লান হেসে বললেন, 'বিশ্বেস করা-না-করা আপনার মরজি। তবে সত্য কথাটা কী জানেন স্যার, একজন ঘটকের অভাবেই বিয়ে হয়নি আমার। হাজার হলেও আমি তো আর নিজের বিয়ের ঘটকালি করতে পারি না।

আমি বেওকুফ বনে বসে রইলাম। তো, যে-লোকের নিজের বিয়ের ঘটক জোটেনি, তাকে তো ঘটকালির স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের চাকরি দিতে পারি না!

এই যুগটা হচ্ছে কম্পুটারের যুগ। ব্যাবাক কাজকর্ম হচ্ছে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে। তাই অনেকে আমাদের ঘটকালির স্কুলের জন্য একটা কম্পুটার বসানোর পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা অবশ্য কানে তুলি নি। কেন যে প্রস্তাবটা আমার কাছে পাত্তা পায় নি, সে কথাটা বলি।

১৯৬৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি ঘটকালির ফারম্ একটা কম্পুটার বসিয়েছিল। বিবাহেচ্ছু তরুণ-তরুণীরা কম্পুটারের মেমোরিতে তাদের যাবতীয় তথ্য ঢুকিয়ে দিত। কম্পুটার তখন কোন ছোকরার সঙ্গে কোন ছুকরীর জোট বাধা উচিত তা জানিয়ে দিত। এ-ভাবে কিছু-কিছু বিয়েও হয়েছিল। তো, একদিন হল কি জানেন? বৌকে তালাক দিয়েছে এমন এক ছোকরা আর-একটি বধূর সন্ধানে কম্পুটারের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ল। তথ্যটথ্য জমা দিল মেমোরি ব্যাংকে। ওদিকে তার তালাকপ্রাপ্তা বৌটিও একটি নতুন বরের সন্ধানে কম্পুটারের কাছে ধরনা দিয়েছিল।

বেরসিক কম্পুটারটি ছোকরার জন্যে নির্বাচন করল তারই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে, আর সেই স্ত্রীটির জন্য বাছাই করল তার সাবেক স্বামীকে। কম্পুটারের এমন বিদঘুটে আচরণে সাবেক স্বামী-স্ত্রী দুইজনই খেপে একেবারে কাঁই।

একজন সাংবাদিক সাবেক স্বামী ভদ্রলোককে শুধিয়েছিলেন—ইয়ে মানে, কম্পুটারের হুকুম কি আপনি মাথা পেতে নেবেন?

ভদ্রলোক : কক্ষনো না। আমি কম্পুটারের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকব।

একই প্রশ্নের জবাবে সংশ্লিষ্ট ভদ্রমহিলা বললেন, বোমা মেরে টুকরো টুকরো করে ভাঙো কম্পুটারটা।

আসলে কী জানেন, বিয়েশাদি হচ্ছে মানবিক ব্যাপার। শুধু ঘটকরাই এসব কাজ ঠিকমতো করতে পারে। এতে কি কম্পুটারের ফোঁপর দালালি করা সাজে?

সবিহ্-উল-আলম [১৯৪০ —]

দাড়ি বিভ্রাট

আমার গালভরা দাড়ি। যেমন ঘন, তেমন কালো। সে দাড়ি এখন গাল ছাড়িয়ে গলা পর্যন্ত জুড়ে বসেছে। অনেকটা সেনাবাহিনীর ব্যারাক ছেড়ে দেশ জুড়ে বসার মতো। সপ্তাহে একবার নিরঞ্জন নাপিতের দোরগোড়ায় ধরনা দিই। সে আমার এলোপাতাড়ি দাড়িকে 'ফল-ইন' করায়, যেটাকে যেখানে মানায় সেটাকে সেখানে পোস্টিং করে। যেসব দাড়ি বেয়াড়া, 'ফল-ইন'-এর আইন মানে না, তাদের কঠিনতম কোর্ট মার্শাল—নিরঞ্জন নাপিত কাঁচি দিয়ে তাদের কচুকাটা করে।

মেজদা, আমি আর ছোটন—মানে মেজদার পরে আমি, আমার পরে ছোটন। আমরা দেখতে যতই একরকম হই না কেন, আমার গালভরা দাড়ির কারণে আমি এক ভিন্ন মানুষ হয়ে গেলাম। কাজেই, মেজদা আর ছোটন থেকে আমাকে আলাদা করে চিনে নেয়া একেবারে সোজা হয়ে গেল। গালভরা কালো কুচকুচে দাড়িতে আমাকে দেখাতে লাগল শিখের মতো। মেজদা বলেন, একটা পাগড়ি হলেই হয়, বিলকুল শিখ বনে যাবি।

এ-দাড়ির অন্যান্য ফজিলৎও পেতে লাগলাম। পথে-ঘাটে এন্তার সালাম পাই, দাড়িওলা পরহেজগার লোক হিসেবে। মেজদার এক দপ্তরি তাঁর রুদ্ররোষে পড়েছিল। সে একেবারে আমার পায়ে হত্যে হয়ে পড়ে, 'হুজুর মা-বাপ, আপনার ছোটভাইকে আপনি একটু বুঝিয়ে বল্লে এবারটি মাফ করে দেবেন।' আমি ইতস্তত করি—অন্য কারণে (এমন দাড়ি নিয়ে 'হুজুর' হওয়া যায়, 'বাপ'ও হওয়া যায়, কিন্তু 'মা'! নাওজুবিল্লাহ!)। সভা সমিতিতে মেজদার বন্ধু-বান্ধবরা প্রথম দেখাতে আমাকে মেজদার বড়ভাই ধরে নেয় আর সসম্মানে দূরে অন্য কোথাও গিয়ে বসে। এভাবেই বিস্তর সম্মান জুটতে লাগল। আমিও ভাবি, মন্দ কী, যো আপ্‌সে আতা হ্যায়, আনে দো।

কিন্তু এরি মাঝে বিপত্তি দেখা দিল।

মেজদা হঠাৎ করে বিয়ে করে বস্‌লেন। সেই চিরাচরিত নিয়মে, সেকেন্ড-হ্যান্ড। মানে, বিয়ে করলেন এক ডিভোর্সড মহিলাকে। তবে বিপত্তির কারণ এসব নয়।

দাড়ি যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এ তো সবারই জানা। একে রাখা না-রাখাও যার-যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। দাড়ি রাখুন আর নাই রাখুন, দাড়ির উপর কিন্তু স্ত্রীদের একটা অলিখিত স্ত্রীগত অধিকার থাকেই। আল্লাহর হক। বান্দার হক। স্ত্রীদের হক। দাড়ির উপর স্ত্রীদের হক, ওটা নিয়ে তাদের ছুঁতবাইয়েরও অন্ত নেই।

বড়দা দূরে আছেন তাই রক্ষে।

কিন্তু মেজদা, আমি আর ছোটন—এই তিন ভাইয়ের সংসারে আগালগলা দাড়ির বদৌলতে আমাকেই বড় দেখাবে, এটা বোধহয় মেজদার সেকেন্ড-হ্যান্ড স্ত্রীর পছন্দ নয়। সুতরাং বছর না-ঘুরতেই মেজদার উপর ভাবীর নোটিশ জারি হয়।

তাই মেজদাও দাড়ি গজাতে শুরু করলেন। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, আর আমাদের দৌড় নিরঞ্জন পর্যন্ত। নিরঞ্জন নাপিত একইভাবে মেজদার এলোপাতাড়ি দাড়িকে 'ফল-ইন' করাতে লাগল। আর মাস না-যেতেই আমি আর মেজদা একাকার, হুবহু এক। দু-জনেই যেন পাগড়িবিহীন শিখ—মুকুটহীন সম্রাট।

বিপত্তির শুরু তখন থেকেই।

কোনো এক অনুষ্ঠানে মেজভাবীর সাথে বেগম মির্জার দেখা। পরের হাঁড়ির খবর নেয়া যদি মহিলাদের জন্মগত চর্চার ব্যাপার হয়ে থাকে এবং সে চর্চার জন্য যদি কোন ডক্টরেট থেকে থাকে, তবে সে ডিগ্রি বেগম মির্জারই প্রাপ্য। এ চর্চায় তাঁর এ্যাপ্রোচ যেমন সূক্ষ্ম, তেমন শৈল্পিক। তিনি শুধু পরের হাঁড়ির খবর নেন্ না, জুৎমতো পরিবেশনও করেন। মেজভাবীর ঘনিষ্ঠ হন তিনি,—ভাইয়ের সাথে সেদিন সিনেমা হলে যে-মহিলাকে দেখলাম, তিনি আপনার ছোটবোন বুঝি? ব্যস্ এতটুকুই। অমনি ভাবীর কাছে অনুষ্ঠানের আনন্দটুকুই মাটি হয়ে গেল। মুখ গোঁজ করে সোজা বাসায় ফিরলেন তিনি।

বিকেলে মেজদা অফিস থেকে ফিরতেই ভাবী মেজদাকে নিয়ে পড়লেন।

আমি? সিনেমায়? মেজদা যেন আকাশ থেকে পড়েন।

এরপর তুমুল বাকযুদ্ধ। হারজিৎ কোন্ পক্ষে হল বোঝা গেল না। তবে সন্ধি যে হয়নি সেটা পরিষ্কার, কেননা একজন উত্তরদিকে তো আরেকজন দক্ষিণদিকে। না TALK-এর মহড়াও চল্‌তে লাগল দু-জনের মধ্যে।

নাটকের টক অংশটাই বোধহয় আমার ভাগে পড়ল, কারণ মেজদা আমার উপর চড়াও হন। আর প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে থাকেন আমাকে। মেজদার প্রশ্ন শুনে আমিও যেন আকাশ থেকে পড়ি—পাগল? আমি আমাদের মানসম্মান খুইয়ে মেয়ে বগলে সিনেমা দেখে বেড়াব? ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা।

মেজদা বিব্রত হয়ে পালিয়ে বাঁচেন।

রাতে ভাবীর হাতে পাকড়াও হই,—মেয়ে বন্ধু-টন্ধু জুটিয়েছ নাকি আজকাল?

আমি একেবারে চিড়বিড়িয়ে উঠি, কে বলেছে? কে বলেছে এসব?

না, মানে মির্জাভাবী বল্‌ছিলেন, তোমার দাদাকে নাকি সেদিন সিনেমায় এক মহিলার সাথে দেখা গেছে।

বারে, তার আমি কী করব। সে তো দাদার ব্যাপার। দাদাকেই জিজ্ঞেস করো, আমাকে কেন?

'ও,' ভাবী চুপ করে গেলেন।

উপস্থিত এই বিপদ থেকে ছাড়া পেয়ে আমি পালিয়ে বাঁচি।

জরুরি কাজে হঠাৎ করেই ঢাকার বাইরে যেতে হয়েছিল কয়েকদিনের জন্য। ফিরতেই ছোটনের সম্মুখীন হই।

সেজদা, তুমিও গেলে আর অমনি এদিকে কীসব কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

কী সব কাণ্ড আবার?

গেল শুক্কুরবার ভাবী দাদাকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

ছোটন বয়ান করে।

খুব ভালো কথা। আমি ছোটনের বয়ানে সায় দিই।

শোনই না তারপরে। দাদা বসেছিলেন বেঞ্চিতে। আর ভাবী কাঠগোলাপ না কী একটা ফুল ছিঁড়বার জন্য একটু দূরে গেছেন। দূর থেকে তিনি লক্ষ করলেন, এক সুন্দরী মহিলা পা টিপে টিপে এসে পেছনদিক থেকে মেজদার চোখদুটো চেপে ধরেছেন। ভাবী কাছে এগিয়ে 'এসব কী হচ্ছে' বলে হাঁক পাড়তেই নাকি মহিলা একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। তারপরে দে লম্বা ছুট এবং উধাও। আর মহিলাকে দেখে মেজদারও আক্কেল গুড়ুম।

তারপর? আমি ব্যগ্র হই পরবর্তী ঘটনা জানবার জন্য।

তারপর আবার কী? মেজদা-ভাবীতে নো টকিং টার্ম। এদিকে গতকাল থেকে ভাবীর দাঁতের ব্য... ... ...

ছোটন 'ব্য'তেই আটকে যায়, 'থা' বলার আর অবকাশ পায় না। কারণ ওদিক থেকে ভাবীর গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসে — 'ছোটন, টেবিলে চা দেয়া হয়েছে, কারো খাওয়ার দরকার থাকলে এসে যেন খেয়ে যায়।

'ছোটন, কারো দাঁত দেখাবার প্রয়োজন হলে যেন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেয়।' এদিক থেকে মেজদার পাল্টা আওয়াজ।'

বুঝলাম, ছোটন লিয়াজোঁ অফিসারের কাজ চালাচ্ছে।

আসলে, আমাকে এমনই হঠাৎ করে ঢাকার বাইরে যেতে হয়েছিল যে, সালমাকেও জানাতে পারি নি।

না জানানোর ফল—ঢাকায় ফিরে সালমার আর পাত্তা পাইনে। আমি তাকে খালার বাসায় খোঁজ করি তো, সে বান্ধবীর বাসায়, বান্ধবীর জন্মদিনে। ওখানে খোঁজ নিলাম তো দেখা গেল সে তার ভাইয়ের বাসায়। মোদ্দা কথা আমি যেখানেই সালমার খোঁজ করি, সে আর সেখানে থাকে না, থাকে অন্য কোনোখানে। অবশেষে সালমার বোন নাজমাকেই পাকড়াও করি—কী ব্যাপার বল তো?

নাজমা দু-হাতের কড়ে আঙুল একটার সাথে আরেকটা লাগিয়ে সালমা-যে আমার সাথে আড়ি দিয়েছে সেটার ইঙ্গিত দেয়।

খুবই কনসার্নিং ব্যাপার।

অতঃপর আমার ঔৎসুক্যে নাজমা সবকিছু খোলসা করে।

গেল শুক্কুরবারে কোন্ এক মহিলাকে নিয়ে নাকি আমি পার্কে গিয়েছিলাম। সালমাকে দেখে নাকি না-চেনার ভান করেছি।

মহিলাটি কে?—বয়ান শেষে নাজমা আমাকে কটাক্ষ করে। আমি সত্যিই আকাশ থেকে পড়ি। যাকে বলে পতন। এত্তোসব কাণ্ড, তাই সালমার আমাকে এড়িয়ে যাওয়া!

তারপরের সময়টা কাটল বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে। প্রেমের আগুন তো আর এমনি-এমনিতেই জ্বলবে না! এ যে আরো চিড়-খাওয়া প্রেম। সবুরে মেওয়া ফলে।

সালমাকে ক্রমেই বাগে আনতে সমর্থ হই। আমাদের প্রেমে আবার জোয়ার আসে। বুঝলাম, সবুর করাতে মেওয়া ফলেছে। এমন পাকা অবস্থাতেই মেওয়া খেতে হয়। তাই, আমি আর দেরি করিনে। ঝটপট বিয়ের এন্তেজাম করি।

বিয়ে-বাড়িতে কনের মুখ দেখে মেজভাবী আমাকে চিমটি কাটেন,—তোমার পেটে পেটে এত বুদ্ধি! এ্যাদ্দিন, খামাকা তোমার দাদাকে সন্দেহ করেছি। তারপর কোন ফাঁকে, এ তথ্যটি ঝাল-মশলাসহ পরিবেশন করেন মেজদার কাছেও। সুতরাং, বিয়ে-বাড়ি থেকে কনে নিয়ে ফিরতে-না-ফিরতেই মেজদা মার্শাল ল জারি করেন, সকালে উঠেই দাড়ি কামিয়ে ফেল্‌বি।

'আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।'

সকালেই নিয়ৎ করি, 'সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।' গুরুজনের আদেশ মেনে চলা ভালো কাজের পয়লা নমুনা। তাই, সালমাকে ঘুমে রেখেই আমি সাতসকালে নিরঞ্জনের দ্বারস্থ হই এবং এমন শখের দাড়ি বিসর্জন দিয়ে গোঁফটুকু সম্বল করে বাসায় ফিরি।

গেটের মুখেই ছোটনের সাথে দেখা। দাড়িবিহীন আমাকে দেখে সে কৌতুকবোধ করে। তুমি কোথায় ছিলে সেজদা? এদিকে কী যে সব কাণ্ড হয়ে গেল।

গেলাম আর এলাম, এরি মধ্যে কাণ্ড?

কাণ্ড বলে কাণ্ড! ছোটন সংবাদ পরিবেশন করে। মেজদা তো ভোরে উঠে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁত ব্রাশ করছিলেন। আর তখন, নতুন ভাবী পেছন দিক থেকে এসে মেজদার চোখ চেপে ধরলেন। মেজদা যতই 'কে, কে' করেন, নতুন ভাবী ততই খিলখিলিয়ে হাসতে থাকেন। মেজভাবী এসে পড়াতে তবেই না রক্ষে।

আমি ভাবনায় পড়ে যাই। সালমার চোখের পাওয়ার কম বলে জানতাম। এখন দেখছি ওকে জরুরি ভিত্তিতে চশমা নিতে হবে। ঘটনাটা যতই ভাবতে থাকি, ততই আমি লজ্জায় মিইয়ে যাই। মেজদাকেই বা ফেস করব কীভাবে! আমি তাই মুখ নিচু করে তাড়াতাড়ি নিজের কামরায় ঢুকে পড়ি।

সালমা লজ্জায়, অপমানে তখনো বিছানায় উপুড় হয়ে ফোঁপাচ্ছে। কী বলে তাকে সান্ত্বনা দেব বুঝতে না-পেরে আমি ওর মাথায় আলতোভাবে বিলি কাটতে থাকি। সালমা আস্তে আস্তে মুখ তোলে, ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকায়। এবং পরক্ষণেই পিলে-চমকানো চিৎকার। সেই চিৎকারে আমি কামরা থেকে ছিটকে বাইরে পড়ি। সবাই হা-হা করে ছুটে আসে। সবার আগে মেজভাবী।

কী হল, এমন করছ কেন? বলে মেজভাবী সালমাকে জড়িয়ে ধরতেই ও ডুকরে কেঁদে ওঠে,—ভাবী, দিব্যি দেখলাম ইয়া গোঁফওলা এক গুণ্ডা আমার পাশে এসে বসেছে।

ধরণী, শুধু আরেকবারটি দ্বিধা হও। আমি মনে মনে বলি।

মেজদা সব দেখেশুনে মার্শাল ল'র দ্বিতীয় ধারা জারি করেন—যা, এক্ষুনি গোঁফ ফেলে আয়। কেমন একখানা চোমড়ানো গোঁফ, দেখলেই প্রাণ ধড়ফড় করে।

সকালেই দ্বিতীয়বারের মতো নিরঞ্জনের দ্বারস্থ হই। ওকে অবাক হওয়ার অবকাশ না দিয়ে বলি, 'এবার গোঁফ।'

গোঁফহীন হয়ে সরাসরি সালমার কাছে যেতে ভরসা পাইনে। আগে গুণ্ডা ভেবেছিল, এবার না খুনী ভেবে বসে। তাই ছোটনের শরণাপন্ন হবার চেষ্টা করি। ছোটনের দরজায় হাল্কা করে টোকা দিই।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে যায়। কোথায় ছোটন! এ তো আমি, এ যেন আয়নার মাঝে আমারই প্রতিবিম্ব। আল্লাহর শান—আমিই যেন আমার ছোট ভাই হয়ে গেলাম। মানে, বাইরে থেকে যে আমি দরজায় টোকা দিলাম, ভিতর থেকে সেই আমিই দরজা খুলে দিলাম!

দাঁড়ি-গোঁফ বিসর্জন দিতেই আমার আর ছোটনের মধ্যে কোনো তফাৎ রইল না।

আমি আবারো নতুন বিপদের আঁচ পাই।

আবদুশ শাকুর [১৯৪১ —]

করিবকর্মা

এবার কিন্তু অনেককাল পরে এলেন আলম ভাই। তাঁর সঙ্গে দেখা তো হয়ই নি স্বাধীনতার পর, তাঁর সম্পর্কে শোনাও হয় নি বহু বছর। আপন-আপন পরান নিয়ে এমন লবেজান হয়ে আছে সবাই, এখন আর কে-ই বা কার খবর রাখে। সকলের সঙ্গে একতরফা যোগাযোগ রক্ষা করে যাওয়াটাকে কর্মযোগ জ্ঞান করতেন আমাদের মধ্যে একমাত্র আলম ভাই, যে-জন্যে হয়তো অন্য কোনো কর্মই তাঁকে দিয়ে কখনো হয় নি। কিন্তু সে কর্মযোগটিও বিয়োগ হয়েছে দেখে, বুঝেই নিয়েছিলাম যে এবার আলম ভাই কিছু-একটাতে নির্ঘাত লেগে গিয়েছেন। অবশ্য না-লেগে থাকতে পারার কথাও তো নয়। পাকিস্তানী আমলের সকল বেকারকেই তো 'রাজনৈতিক শিকার' পদবি দিয়ে বেশ উচ্চশাখে আসীন করে দিয়েছেন স্বাধীন সরকার। এসব কর্ণধার আবার এমন মগডালে বসে জাতির কর্ণ ধারণ করেছেন যে আমার আকাশ-ছোঁয়া আন্দাজের ঢিল তাঁদের পদও স্পর্শ করতে পারে না। আলম ভাই সম্পর্কে তো সর্বশেষ খবরে প্রকাশ ছিল যে, তিনি চাপ সৃষ্টিকারী চাপকান পরে—নিষ্ঠাবানের মতো অচেতন বাণীবর্ষণ আর চোঙার ফুৎকারে বাঙালিসৎকারের শীতল শয়তানির কর্ষণেই সামিল হয়ে গিয়েছেন। সুতরাং পার্টির একজন পেটি-কুতুব হিসেবে তিনি কোন্ কুতুবমিনারের মুয়াজ্জিন হয়েছেন, সেটা আগেভাগে একটু জেনে না-নিয়ে এগুনো ঠিক হবে না। তাই আলাপ শুরু করলাম অতিশয় সতর্ক সংলাপে :

'শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামলেন আলম ভাই?'

আলম ভাই তাঁর বিখ্যাত সেই আলস্যমণ্ডিত মুদ্রায় শরীরখানি এলিয়ে দিলেন সোফায়। এরমধ্যে বয়েসটাও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে মনে হল। হয়তো দুরন্ত যৌবনটা কাজ-বিনা কাটিয়ে দেয়াতে পড়ন্ত যৌবনে এসে কর্ম বস্তুটিকে একটু কষ্টকরই ঠেকছে। একান্ত কর্মক্লান্ত কণ্ঠেই কথা বললেন তিনি :

'জীবনে তো অনেক কিছুই করলাম হে। শেষপর্যন্ত ভাবলাম চাকরিটাই আমার জন্যে ঠিক—'

শুনে আমার তো উল্লাসে ফেটে পড়ার অবস্থা :

'সাঙ্ঘাতিক ভালো খবর শোনালেন তো আলম ভাই! এই মহান বিপ্লবটা ঘটল কোন্ সালে? আপনার মতো মানুষেরও চাকরিতে মন বসল কত দিন হল?'

আলম ভাই তাঁর মুখবন্দী ধূম্রপুঞ্জ দিয়ে থেমে থেমে তিনটি রিং রচনা করে যেন উদাহরণ সহকারেই বোঝাতে চাইলেন :

'তিন বছর।'

এটুকু বলেই অবশ্য থেমে গেলেন গুরুদেব। থেমে থেমে বলাও তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল বরবের। তবু খবরটা তো জবর। বাঙালির সাধারণ আয়ু পার করে দিয়ে হলেও, একটা কর্মান্ত-সিদ্ধান্ত তো যাহোক এ-জন্মেই নিতে পেরেছেন তিনি। এবং বেকারির ভোঁতা দাঁতের আঘাত থেকে বেশক নাজাতও পেয়েছেন—হোক-না তা দলীয় উর্দির উপদ্রবেরই পথে। ওদিকে জনসেবার লগ্ন বয়ে যাচ্ছে দেখে আমার তৃষিত মনটাকে বোঝালাম যে-বাকি বৃত্তান্ত অফিস-ফেরতই শোনা যাবে সবিস্তারে।

জনসেবা তো নয়, বস্তুত দুর্জনসেবা। পূর্ণতর অর্থে—শিষ্টের দমন আর দুষ্টের পালন। পরগাছা পোষণের জোগাড়যন্ত্রেই জনসেবার কম্ম কাবার হয়ে যায়। মস্তিষ্কের করোটির মতো জাতির অঙ্গীভূত হয়ে গেলে, স্বৈরতন্ত্রের শিরস্ত্রাণ থেকে পরিত্রাণ কী করে সম্ভব? অতএব, টাউটের রিপোর্টেই আপনার ওপর কোর্ট বসে। তবু আজ কট্‌কটে কোট আর চট্‌চটে চাদর দেখলেই সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছিলাম শুধু আলম ভাইয়ের কথা স্মরণ করেই—এসবের চোটেই তো তাঁর জন্মের জটটা শেষতক খুলল।

আলম ভাই আমার এক সুদূর জ্ঞাতির বংশের একমাত্র বাতি। খালু সাহেব তাঁর সুপ্ত আশা আদৌ গুপ্ত রাখেন নি। পুত্রের নামের ভাষাতেই সব খোলসা করে গিয়েছেন—খোরশেদ আলম, অর্থাৎ কিনা জগতের সূর্য। কিন্তু সূর্যটা দেখা গেল জন্মাবধিই রাহুগ্রস্ত—যাবজ্জীবন নানাদণ্ডপ্রাপ্ত। তবু যেহেতু সূর্যই—এক রূপের আগুন রাবেয়া খাতুন ছাড়া যা-কিছুর সংস্পর্শেই তিনি গিয়েছেন, ভস্ম হয়ে গিয়েছে ; যা-কিছুতেই হাত দিয়েছেন, বিফলে গিয়েছে; যা-কিছুই আঁকড়ে ধরেছেন, ফসকে গিয়েছে। ফসকান নি খালি আমাদের রাবেয়া ভাবী। তিনি বিফলেও যান নি—বরং বেজারটিও না হয়ে চারচারটি হারে পুত্রকন্যা প্রসব করে একটিমাত্র বাতির ঘরে ঝাড়লণ্ঠনের ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন। আজ থেকে প্রায় পনের বছর আগে আই.এ. পাস দিয়ে আলম ভাই মাস্টারি, ব্রোকারি, ঠিকাদারি, দোকানদারি—অনেক কিছুই গভীরভাবে ভেবেছেন অনেককাল, এবং অস্থিরভাবে করেছেন কিছুকাল। কিন্তু উদ্যোগের অভাব আর আলস্যের প্রভাব হেতু, হয় নি কিছুই, বরং গিয়েছে সবই—বাবার জমি থেকে মায়ের জমা, মনের উদ্যম থেকে দেহের দম। এক কথায় লোটাকম্বল-পথসম্বল সব গিয়ে আলম ভাইয়ের ছিল এক পিতৃদত্ত নাম আর পত্নীদত্ত বদনাম। অথচ তিনি নিজে কিন্তু নিতান্তই নির্বিকার, নিষ্কাম।

তাঁর বুকে কোনো বিক্ষুব্ধির লেশ নেই, তাঁর অন্তরে কোনো অশান্তির রেশ নেই। কেননা, ভাণ্ডারে তাঁর বিবিধ রতন—স্বস্তির আর সান্ত্বনার। আলম ভাইয়ের নেই কী? সব অভাবেরই যুৎসই জবাব আছে। সব ব্যর্থতারও বিশদ ব্যাখ্যা আছে। তাঁর যাবতীয় ব্যর্থতার অব্যর্থ ব্যাখ্যাগুলিকে দুটি সারিতে সাজানো যায়। প্রথম সারি : তাঁর যাপন-করা জীবনটির কার্যকারণ সম্পর্কিত। যেমন, কার্যটি হল—আলম ভাই মাস্টারিটা করতে গিয়েও করলেন না। সম্পৃক্ত কারণটি হল—যেহেতু মাস্টারে আর ডাস্টারে তফাৎ নেই। ধরুন, ব্যর্থতাটি হল—আলম ভাই ঠিকাদারি করতে পারলেন না। সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যাটি পাবেন—ঠিকাদারি মানেই চুরিচামারি, যা ভালো পারাও ভালো নয়। তেমনি ব্রোকারি হল না, কারণ ওটা বাটপারি। দোকানদারি চলল না, কারণ ওটা বাকিবকেয়ার ঝকমারি। আর দালালি তো—খোলাখুলিই গালি।

এ-তো গেল এক সেট। আলম ভাইয়ের আরেক সেট ব্যাখ্যা হল : যে-জীবনটি তাঁর হতে পারত, সেটি না-হওয়ার কারণ সংবলিত। যেমন তিনি আজ বিলেত-ফেরৎ ব্যারিস্টার হিসেবে মাসে দশটি হাজার টাকা বানাতেন—কিন্তু তা তিনি বানাচ্ছেন না যেহেতু আই.এ. পরীক্ষার পরেই তাঁকে বেকায়দায় ফেলে তাঁর বাবাকে মারা যেতে হয়েছিল। অথবা আজ তিনি এক বিরাট শিল্পপতি হয়ে থাকতেন—কিন্তু তা তিনি থাকেন নি শুধু এ-জন্যে যে, আইয়ুবি আমলে কেউ তাঁকে প্রাথমিক মূলধনটুকু দিয়েও চালু করে দেন নি। কিংবা আলম ভাইয়ের কনসাল্ট্যান্ট ফার্ম আজ মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত—তবে সেটি জন্মগ্রহণই করে নি শুধু দশটি পয়সার রেটের তফাতে; সেবার দশ লাখ টাকার ওয়াপদা-টেন্ডারটি ফসকে গিয়েছিল বলে। নিদেনপক্ষে আলম ভাই আজ তাঁর গুলশানের বাড়িটি ভাড়া দিয়ে ইস্কাটনে ভাড়াবাড়ি নিয়ে জনৈক প্রাক্তন মন্ত্রীর শৌখিন জীবনটি যাপন করতেন—কিন্তু তা তিনি করছেন না যেহেতু একাত্তরের রাজনীতির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়ার জন্যে বেকার বসে না-থেকে, রাবুভাবির যৌবন-জোয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়ে সংসারের কারাগারে বন্দি হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

মোট কথা আলম ভাই খৃস্টের মতোই ক্ষমাসুন্দর—যেমনি নিজের প্রতি, তেমনি জগতের প্রতি। যেহেতু ওঁর মতে—সৌরজগতের সকল অপরাধই মহাকাশের ওই গ্রহতারার, তাঁর নিজের করার মতো কিছুই নেই।

কার্যত কিন্তু যত মনে হয়, তত নিষ্কর্মা আলম ভাই নন। বরং তাঁকে করিতকর্মা না বললেও, করিবকর্মা তো বলতেই হবে। কেননা, কর্মটা তিনি বরাবরই করেন—তবে বর্তমানকালে নয়, ভবিষ্যৎকালে। বর্তমানে কেবল ভবিষ্যৎকর্মের ছক কাটেন, আর অতীতের ত্রুটি ঘাঁটেন। ফলে, তখন অমন করলে এখন এমন হত আর এখন এমন করলে তখন অমন হবে—এবংবিধ বচনই শুধু শুত হয় তাঁর শ্রীমুখ থেকে। এককথায়, কর্তব্য সম্পর্কে সদা সচেতন এবং সম্পাদন সম্বন্ধে আপাতঅচেতন আলম ভাই আমাদের অনেক বিশেষণেই বিশুত ছিলেন—অতীতের স্বাপ্নিক, বর্তমানের দার্শনিক, ভবিষ্যতের নাগরিক। এবং এমনি অবৈতনিক আরো অনেক উপাধিতেই ছিলেন ভূষিত।

এহেন আলমভাইয়ের এমন ঘোরতর রূপান্তর! তাঁর উনচল্লিশ বছর বয়সের মোট তিন বছরের এই কর্মজীবনটা কেমন লাগছে, তা সবিস্তারে জানার অদম্য কৌতূহল সারাক্ষণ কেবল কাতুকুতু দিচ্ছিল আমাকে। তাই সন্ধ্যানাগাদ বাসায় ফিরেই তাঁকে বারান্দায় টেনে এনে আরামকেদারায় বসিয়ে দিয়ে বললাম :

'একেই বলে মানুষের মন আলম ভাই! প্রায় সিকি শতকের গবেষণার পরে কর্মজীবনটি আপনি শুরু করলেন—তাও ওই চাকরি দিয়েই? আপনার সেই জন্ম-জন্মান্তরের কৃপার বস্তুটি? যাক, থাকগে ওসব। আগে বলুন চাকরিটি কী?'

রেখায়িত চেহারায় ঈষৎ জোছনার মতো স্নিগ্ধ একটুকরো হাসি ফুটিয়ে স্খলিত-স্বরে আলম ভাই শুধু দুটো শব্দই করলেন :

'ভাবতে হবে।'

অপয়া সেই অসমাপিকা-ক্রিয়াপদের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনে একটু অস্তস্তিই বোধ করলাম—ভাবতে হবে! তবু ভাবলাম—দায়িত্বটার বিষয়বস্তু হয়তো এক-কথায় বোঝানো মুশকিল। তাই একেবারে নির্দিষ্ট একটি প্রশ্নই করলাম পূর্ণ উত্তরের উদ্দেশ্যে :

'কাজটা কোথায় আলম ভাই?'

এবারে ভাই একটু নড়েচড়ে বসলেন। এবং বসতে বসতে উত্তরও দিলেন—তবে সেই দুটি শব্দেই :

'দেখতে হবে।'

আমি এবারে আঁৎকেই উঠলাম : সে কী, আবারো সেই অলক্ষুণে অসমাপিকা ক্রিয়া—দেখতে হবে ! এ কি শুধু নির্দোষ মুদ্রাদোষ ? না কি এই অন্তিম ত্রিশের ত্রিকাল দর্শনের অন্তেও সেই ভবিষ্যতের নাগরিকই রয়ে গেলেন আলম ভাই। সহসা সন্দেহটা আমার উচ্চকিতই হয়ে উঠল—তাই তো। সেই আসা-অবধিই তো কেমন জানি ঠাণ্ডা মেরে আছে মানুষটা। না, সংশয় আর নয়। দেখি, খোঁচা মেরে চাঙা করে তোলা যায় নাকি লোকটাকে—খোঁচার বিরুদ্ধে তো গুরু বরাবরই ছিলেন তপ্ত বারুদ। অতএব সসংকোচে এবারে আমি একাধিক নগ্ন প্রশ্নই ছুড়ে মারলাম একনাগাড়ে :

'কিছু মনে করবেন না আলম ভাই, চাকরি আপনি ঠিক নিয়েছেন তো ? মানে কাজে যোগ দিয়েছেন তো ?'

তাঁর কাজের যা-ই হোক আমার কাজ অবশ্য হল—আলম ভাই অতঃপর কথা বলতে শুরু করলেন :

'তা ছাড়া আর কিইবা করার আছে দেশে বলো ? যে-রকমেরই হোক, চাকরি-বাকরিতেই তো যোগ—দিতে হবে।'

দিতে হবে ! বুঝলাম। চাকরি করার নিয়তটা বাঁধার পরও মনের মতো কাজ জোটাতেই বেচারার তিনটি বছর পার হয়ে গিয়েছে। অতএব আর শরম না করে আমিও আমার মনের মতো আলাপই শুরু করে দিলাম :

'চাকরিটা তাহলে হালেই পেয়েছেন। এবং পেয়েই চলে এসেছেন যোগ দিতে ?'

'হ্যাঁ, একরকম চলেই এসেছি বলতে পার। তোমার ভাবীর ভাবেসাবে মনে হল—ঘর ছেড়ে দু-চার দিন ঘুরেফিরে আর সফর থেকে ঘরে ফেরা যাবে না। তারই বা দোষ কী বল। ঘর-সংসারের যা অবস্থা ! আমিও শেষপর্যন্ত ভাবলাম : আর লজ্জা শরম নয়। কাজকর্ম যা-ই হোক, এবারে আমাকে কিছু-একটাতে—লাগতে হবে।'

লাগতে হবে ! তাহলে ভাইয়ের বেলায় ভাবান্তর নয়, ভাবীর ঠেলায় দেশান্তর মাত্র। আসলে আলম ভাইয়ের এই পরিপক্ব বয়সে তেমন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আর আশাও করা যায় না। তবু ইতিমধ্যে এত বেশিদিন পার হয়ে গেল যে, বেশি না হলেও কিছু উন্নতি তো হওয়ারই কথা। সেটুকু একটু মেপে দেখার খেয়ালেই জিজ্ঞাসা করলাম :

'কিন্তু দেরি হয়ে যায় নি তো ? কবে খোঁজ পেয়েছেন কাজটার ?'

ম্লান হেসে মন্তব্য করলেন আলম ভাই :

'চাকরির খোঁজ কি কেউ কাউকে দেয় ভাই ! খোঁজখবরও তো নিজেকেই—নিতে হবে।'

নিতে হবে ! তার মানে ব্যাপারটা খবরের স্তরেও পৌঁছায়নি এখনো। তবু আমি একটা অসাধারণ শান্তিবোধ করছি যে-অভাবনীয় আবিষ্কারে, সেটি হল : রাজকীয় শোষক-শাসক দলের চোগা-চোঙা ধারণ-পরিধান করেও আলম ভাই আপন বিবেক বধ করে নিজের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণই আদায় করে নেন নি তাঁদের পাতিনেতা-জাতিনেতাদের মাধ্যমে। সেই খাতে এই নির্লোভ মানুষটির প্রতি সলোভ পুরুষ আমি বরং আরো সসম্ভ্রমই হয়ে উঠলাম :

'তা ঘরের কাছের চাটগাঁয়ও কোনো কিছুর খোঁজ পেলেন না? ক্ষমতাসীন দলের একজন নিঃস্বার্থকর্মী হয়েও সামান্য একটা চাকরির খোঁজে আপনাকে ঢাকা পর্যন্ত ছুটে আসতে হল?'

'ছুটে আসা ছাড়া উপায় কী বল! কোনো কাজই কি হয় ছোটাছুটি ছাড়া? প্রথমে ঢাকায় ছুটে এলাম, এখানে না হলে চট্টগ্রামে ছুটে যাব; সেখানে না-হলে খুলনা-পাবনাও—ছুটতে হবে।'

ছুটতে হবে! এবং ছোটাছুটিরও এখান থেকেই শুরু। চমৎকার! তার মানে, মনে হচ্ছে আলম ভাই নিঃসন্দেহে আদি এবং অকৃত্রিমই রয়ে গিয়েছেন। সুতরাং আমিও মুক্তছন্দই হয়ে যেতে পারি :

'অযথা ছোটার আগে, ছুটে গিয়ে যে-শক্তিধরদের ধরতে হবে তাঁদের ধরার ব্যবস্থা করেছেন? যাঁদের নাম এককালে ছিল নগর-কুতুব, বর্তমানে শহর-শেখ—আসলে সেই সর্বকালের টাউন-টাউট আর কী!'

আলম ভাই যেন এই প্রথম একটু আহত হয়েই কথা বললেন :

'ও, মামার ব্যাপারটাও শিখিয়েই দিচ্ছ? তা, মামা ছাড়া যে আজকাল কোনো প্রাপ্তবয়স্কেরও হামা ছেড়ে দাঁড়ানোরই জো নেই, সে-জ্ঞানটুকু অন্তত উন থাকে নি এই উনচল্লিশ বছরে। আরে ভাই, সর্ব অবস্থাতে সর্বপ্রথমে ওই মামাই তো—ধরতে হবে।'

ধরতে হবে! তবে রে! তবু রক্ষে যে গুরুমশাই রাগের বশে রিস্তাটাই ভুলে গিয়ে বলে বসেন নি যে, তোমাকেই মামা ধরলাম ভাই! তবে তাঁর কথার ঢঙে সন্দেহ আমার ঘোরতর ঘনীভূত হল যে, ভাই আমার হালের মামা ধরার হাতিয়ারটুকুও জোগাড় করেছেন কি না! না কি নগরকুতুব ধরার সেকেলে ফুল-মিষ্টির সিধে দিয়েই তিনি একালের শহরশেখ ধরার সুখস্বপ্ন দেখছেন। লোকটাকে তাই গোড়াতেই কিছু মামুলি জ্ঞান দান করা জরুরি ভাবলাম আমি :

'সরকার সারাদেশের তামাম 'মাতুলতা'র একমাত্র এজেন্ট হিসেবে শুধুমাত্র স্বীয় গোষ্ঠীটিকেই স্বীকৃতি দেওয়ার পরিণামে মামা আর ইদানীং এমনি ধরা যায় না—নিলামেই ধরতে হয়। সেই নিলামের দামটা—অন্তত উপস্থিত অগ্রিমটা—জোগাড় করে এনেছেন তো আলম ভাই?'

'এও কি কারো অজানা ভাই! আমরা তো সরকারেরই ওয়ার্কার। মামার মধ্যেও, ধর—বংশমর্যাদায়, ধ্বংসক্ষমতায়, নির্ভেজাল মাল আর কত। অতএব চড়া ডাকে নিলাম তো হবেই। তাই মোটামুটি টাকার জোগাড়েই—নামতে হবে।'

নামতে হবে! বটেই তো। এবং আমাকেও এবার ঘামতে হবে। নগদ-নিলামের মামা-বাজারে তিনি এসেছেন যত বাকি ক্রিয়াকলাপের বাজেটসর্বস্ব হয়ে! এতক্ষণে আমি সম্পূর্ণ হতাশ হলাম। লোকটির রক্তিভর উন্নতিও হয় নি দেখছি—অন্তত বর্তমানকালের বিচারে। আর শুধু পরখ করে দেখতে হবে যে, ভবিষ্যৎকালের ব্যাপারেও করণীয় কর্মটির সুসমাপ্তি পর্যন্ত পরিকল্পনা প্রণয়নে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে-থাকার সেই সীমাহীন অধ্যবসায়টুকু তাঁর এখনো বাকি আছে কিনা। মানে অমূল্য এই 'করিবকর্মা'-পুরুষটির অতঃপর মৌল প্রতিভাটি মূল্যায়নেরই পালা :

'তবে কেনা-মামা নাকি আসল জাতের হলেও যৎকিঞ্চিৎ অধিক দাম পেলেই পিছলে গলে যায়। অথচ সঠিক চিনেশুনে যে-কোনো একটি পদ জড়িয়ে ধরলেই নাকি পদবি-পদক থেকে পদস্থ চাকরি পর্যন্ত সবই সুনিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু আলম ভাই, আপনি কি অতটা পারবেন?'

হবুকর্মী ভাইটি আমার এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন বেশ জোরেশোরেই :

'সে-খেয়ালও আছে বৈকি! সঠিক পদখানি লেহন করতে পারলে যে-কোনো পদেরই নিরাপদে নিশ্চিতপ্রাপ্তি—এ-তো আমাদের দলীয় সমাজতন্ত্রেরই অন্যতম মূলনীতি। সুতরাং কর্তব্য-কর্মই যখন, প্রয়োজনবোধে পায়ের ওপরও—পড়তে হবে।'

পড়তে হবে! মাশাল্লা! একেই বলে কর্তব্যসচেতন সমাজতন্ত্রী। তবু আরেকটুখানি বাজিয়ে নেয়ার খেয়ালে এবারে অনেকখানিই বাড়িয়ে বললাম :

'আপনি তো জানেনই আলম ভাই, এসব লেহ্যপদাবলি সংবলিত পদস্থ পুরুষগণের পদলেহনের কৃপাপ্রার্থী সীমাহীন—এবং সুযোগের সন্ধানে সবাই ঘুরঘুরও করে সর্বদাই। অতএব আপনি একটা পা ধরতেই আরেকজন যদি আরেকটা পা ধরে ফেলে, তবে তো ড্র হয়ে যাবারই ডর। অথচ যত পদস্থই হোন—পুরোপুরি পশু যখন নন, পদ তো মাত্র দুটি। তাই হিসেবটা বেশ সোজাই—দু-খানি চরণই আপনি এককালীন দু-হাতে জাবড়ে ধরে ফেলতে পারলে, আর কোনো রিস্কই থাকে না। কিন্তু ভাই, এতখানি কি আপনার পক্ষে সত্যি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?'

'না। তাড়াতাড়ি আমার বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দিতে পারে—তেমন কিছুছুই আর বাড়াবাড়ি হবে না। তুমি তো জানো ভাই, বিগত উনচল্লিশটি বছর ধরে কেবল 'করণীয়'-কর্মেরই কর্ষণ করতে-করতে আমি একধরনের অসাধারণ কর্মী হয়ে উঠেছি। অতএব 'কর্তব্য'-কর্মে গাফলতি, সে আমার নয়। চাকরির জন্যে দরকার হলে আমাকে দু-পায়ে মাথা খুঁড়েই—মরতে হবে।'

মরতে হবে! নাউজোবিল্লা! একেই বলে কর্তব্যে নিষ্ঠা। সত্যকারের মরণপণ 'কর্তব্য'-পরায়ণ আমাদের করিবকর্মা আলম ভাই। অতএব সেই 'ভাবতে হবে' থেকে দেখতে হবে, দিতে হবে, লাগতে হবে, নিতে হবে, ছুটতে হবে, ধরতে হবে, নামতে হবে, পড়তে হবে, মায় 'মরতে হবে' পর্যন্ত—তাঁর সঙ্গেকার এই সারগর্ভ সংলাপের সার-সংক্ষেপটা অনুমোদন করিয়ে নেবার আশাতে ভর করেই শুধু অমি মন্তব্যটুকু উচ্চারণ করলাম :

'তাহলে আলম ভাই, আপানার চাকরির সব কিছুই এখনো সেই 'হবে'ই—হয়েছে কেবল করার পরিকল্পনাটাই।'

'উপায় কী ভাই! 'কর্তব্য'কার্য কিংবা 'করণীয়'কর্ম ছাড়া তো কাজের মানুষের বাঁচাই দায়। তাই একটা-কিছু তো আমাকে অবশ্যই—করতে হবে।'

করতে হবে! ইনশাল্লা! তবে আপাতত আমার পুঞ্জীভূত বিরক্তিটি শেষমুহূর্তে একটি উক্তিরূপে-হলেও ব্যক্তই হয়ে গেল—যার অর্থ বস্তুত ইন্নালিল্লার মতোই :

'এ-আপনার নিতান্তই বিনয় আলম ভাই। শুধু-আপনাকে কেন, কেবল একটা-কিছু কেন—কবির প্রত্যয় 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি' যদি সত্যই হয়; তবে বাংলাদেশ তো ভবেরই ভবিষ্যৎ। অতএব আমাদের ক্রিয়ামাত্রই তো ভবিষ্যৎকালেই—করতে হবে।

হুবহু দ্বৈতকণ্ঠের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণে আমাদের এই মহান বিধেয়টা বাংলাদেশের শ্লোগানের মতো, অথবা শূন্যপত্রের নিনাদের মতোই শোনাল না কি?

বিপ্লব দাশ [১৯৪৮ —১৯৯৭]

ব্যাচেলর

গাও-গেরামের রাম-রহিম-রোমেল, সে যে-ই হোক-না কেন, না-পালিশ গেঁয়ো গলায় অহরহ একটি নালিশ গাইতে শোনা যায় বয়সকালে। বয়স যখন তেতে উঠছে ভিসুবিয়াসের মতো যৌবনের আঁচে, তখন ধারে-কাছের তেঁতুলগাছে উঠে বাপ কিংবা দাদার উদ্দেশে তোলে পুরোপুরি গানের তান। তানপুরা নেই, একতারা-দোতারা নেই, এমনকি প্যাথোজ সুরের বেহালার ছড়ও টানতে হয় না তাকে, তবু হায়-হায় করা বুকের ভেতর থেকে তেঁতুলের মগডালে অসহায়ভাবে বসে গ্রামবাসীদের জানান দিয়ে উচ্চগ্রামে গলা তোলে— 'দাদা আমায় বিয়া করায় না।'

তেঁতুলতলায় গলার জোরে লোক জড়ো হয়ে গেছে ততক্ষণে। সবাই বলছে, 'নামো-নামো। ঐ ডালটা নরম, তোমার ভার সামাল দিবার পারব না।' মগডালে বসা বিবাহিত দাদার অবিবাহিত ভাইটির বলিহারি জবাব— 'তয় যে আমার ভার সামাল দিবার পারব তারে দেও। ডুলি পালকি চইড়া সেই ডলির ডালে গিয়া বসি।' বুঝতেই পারছেন ডালে বসা ডালিয়াৎটির সঙ্গে ডলি মেয়েটির ডাল মে কুচ কালা হ্যায়।

গাছের নিচের গ্রামবাসীর গলা, 'তা বস না গিয়া ডলির ডালে। আপত্তি কিয়ের। ডলির লেইগা ডেলি ডেলি, টিনের চালে, তেঁতই ডালে, নাড়ার গাদায়, বনে-বাদায়, খালে-বিলে, হাওর-বাঁওড়ে হায়-হায় কইরা বৈজু বাওয়ার মতো হা-হুতাশ কইরা আমাগো হয়রান করস ক্যান।'

বৈজু বাওরা তখন তেঁতুলের ঝোপ বুঝে মাটিতে আসল কোপটি মারতে চায়। কুপিত কণ্ঠে, গলদেশে কাঁপন তুলে। তলদেশে সে কাঁপনে তখন কাঁচাপাকা তেঁতুল পড়ছে—সবাই কুড়োচ্ছে—'দাদা আমায় বিয়া করায় না।' এদিকে বিবাহিত খেতাবে কুপোকাৎ দাদা হিতাহিত ভুলে ছুটে আসে কুপিত ভাই ও তেঁতুলতলার স্তূপিত পঞ্চায়েতকে তুষ্ট করার জন্য।

ডালের ভাই বলে, 'দাদা আমায় বিয়া করায় না।'

তলের ভাই বলে, 'বিয়ার ঠ্যালা বড় ঠ্যালা—পরাণ আমার যায়রে/কেন যে আমি বিয়া করলাম হায়রে/গুষ্টির মধ্যে দশটা পোলা/ফাল দিয়া ধরে আমার গলা/বাজান-বাজান বোলাইছে/কাইল যামুগা শ্বশুরবাড়ি বেড়াইতে।'

দশ পোলার ইজ্জতের কথা তুলেও ভাইকে জুতে আনা যায় না। জুতিয়ে দিতে মন চায় কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। তেঁতুল পেয়ে পাবলিক এখন ছোটভাই-এর ফরে। ফাইরা ফালাইব। অগত্যা কাজি ডেকে বৃক্ষতলেই মালাবদল করে ডলিকে বক্ষে তুলে দেয়া হল।

নইলে রক্ষে ছিল না। মালাবদলের প্রস্তুতি না নিলে ম্যালা ঝামেলা হত। স্তুতি করলে ছোটভাই নরম ডাল থেকে শক্তডালে হয়ত যেত— কিন্তু নামত না। ভাই এখন কাজির ডাকে রাজি হয়ে নেমেছে। নেমে গিয়ে বসেছে ডলির ডালে। একদিন ডলির ডলায় ডালপালা গজাবে সংসারে—তখন বুঝবে ঠ্যালা, বিয়ে কাকে বলে।

বিয়ে যাকেই বলুক, বিয়ের ঠ্যালা যেমনই হোক, পৃথিবী জুড়ে ঘরে-ঘরে প্রত্যেকেরই বিয়ের দিকে ঝোঁক। চারটা না হোক—দেনা করে হলেও নিদেনপক্ষে একটা বিয়ে করা চাই। করে সকলেই, তবু কেউ কেউ করে না। বাচপান থেকে যতদিন বাঁচা ততদিনও ব্যাচেলর হয়ে বেঁচে থাকেন। কনফার্মড্ ব্যাচেলর। বিয়ে করার আগে সবাই ব্যাচেলর থাকে বটে তবে বিয়ের পরে আর ব্যাচেলরি ফলানো যায় না। ফলালে গিন্নির চ্যালাকাঠের ঘা খাবার আশঙ্কা। যার কাজ তাকেই সাজে। ব্যাচেলরি ব্যাচেলরকেই মানায়। বলবেন, ব্যাচেলরি সেটা আবার কী? আছে, ব্যাচেলর যেমন আছে, তাদের ব্যাচেলরিও আছে। আমি বিয়ের জন্য ব্যাঁ-ব্যাঁ করা ব্যাচেলরদের কথা বলছি না। আমি বলছি সেই ব্যাচেলরদের কথা, যারা একা একটি ঘর নিয়ে থাকেন। ঘরে সিঙ্গল খাট, খাটে দাগ-লাগা খটখটে বেডশিট যা দেখলে বিবাহিতরা নাক সিঁটকাবেন, কিন্তু সেই নিঃসঙ্গ অবিবাহিতটা সেটার সঙ্গে দিব্যি সেঁটে থাকেন। পাশবালিশও আছে একটা। বেচারি ব্যাচেলরদের জন্যে ইট ইজ এ মাস্ট, ব্যাচেলরদের কলজে বলেই পাশবালিশকে বোধহয় কোলবালিশ বলা হয়। সে আবার ক্যামন ধাঁচের ব্যাচেলর যার কোলবালিশ নেই! তবলচির তবলা থাকবে না তাকি হয় না কি! বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। তবলা না থাকলে যা দিয়ে ধা-ধিন-ধিনতা ত্রি-তালের বোল ফোটাবে কোথায় তবলীয়া? তবলা যেমন কোলবালিশও তেমন, যার সঙ্গী যে সে-ই সঙ্গত করে। অকৃতদার পুরুষের উর্বশী হচ্ছে কোলবালিশ। তিলোত্তমা চাই কি তুলোত্তমাও বলা যেতে পারে, যতদিন না উত্তমরূপে বোঝাই-করা তুলো বেরিয়ে না-আসে। অকৃতদারের কৃতকর্মের ফলে তিলোত্তমা, যতদিন তুলোধোনা দশা হয় ততদিনই সে উত্তমা। ব্যাচেলরের শয্যাসঙ্গিনী।

শয্যা নিয়ে আতিশয্য হয়ে যাচ্ছে বেশি—শয্যা ছাড়াও ব্যাচেলরের ব্যাচেলরির আরো দিক দেখবার আছে—সেটি হচ্ছে শয্যাতল। গদি তুলে পায়ের কিংবা মাথার দিক দেখুন। দেখেই খুন হয়ে যাবেন। বিপন্ন ও বিব্রত হয়ে দেখবেন দেশি-বিদেশি নানান পর্নোগ্রাফি পুস্তক-পত্রিকা গদিতলে গাদাগাদি করে ঠাসা। দিশেহারা ভাষাহীন হয়ে মনে-মনে ভাববেন—এ কী! ভেবেছিলাম তো ভদ্রলোক মার্জিত সুরুচিসম্পন্ন, কিন্তু এ-কেমন ব্যাচেলর মানুষটি। বেরিয়ে এল গদি খুঁড়তে সাপ! ব্যাচেলরটি মার্জিত ও রুচিবান কি না, সে বিচার আপনার মর্জি ও অভিরুচির ওপরে নির্ভর করে বলেই এ-ধরনের উষ্মা। তবে বুকে টোকা দিয়ে বলতে পারি, আপনি যদি ব্যাচেলর হতেন এবং আরেক ব্যাচেলরের তোশক ওল্টাতেন, তবে তোষামোদ করে অতি আমোদে পর্নো বইটির জন্যে তোশকাধিপতি পর্নোমালিকের পায়ে পড়তেও কার্পণ্য করতেন না। ধার চাইতেন ফেরত দেবার অঙ্গীকার করে এবং যথারীতি কথামতো ফেরত দিতেন না। অন্য কোনো ব্যাচেলর কিংবা অন্য কোনো ম্যারেডকে দিয়ে আপনার বেড থেকে রেড করিয়ে ধারের মাল উদ্ধার করাতে হত। পর্নোর প্রতি সম্পূর্ণ হৃদয় ধাবিত শুধু অবিবাহিত ব্যাচেলরের নয়—বিবাহিতেরও । হতে পারে ফুটপাতের বইওলাদের পাশ ঘেঁষে যাবার পথে পর্নের হর্ন শোনার জন্যে ব্যাচেলর মাত্রই

উৎকর্ণ হয়ে থাকেন—সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু ম্যারেডরাও গুলিস্তান এলাকার মোড়ে-মোড়ে পর্নোঘোরে কম ঘোরেন না। যা-কিছু নিষিদ্ধ তাতেই মানুষ মজে—এ-মত তো স্বতঃসিদ্ধ। খোদার নিষেধ সত্ত্বেও শয়তানের ফাঁদে অতি আহ্লাদে সবকিছু একদম ভুলে নিষিদ্ধ ফলটি কি আর সাধে খেয়েছে আদম? এই আদমেরই তো আদমী আমরা—কাজেই কমবেশি এ্যাডাম কমপ্লেক্স সবার মধ্যেই আছে। নিষিদ্ধ বই তাই বিবাহিতেরও কাম্য—রোজকার খাবারের সঙ্গে তাই কিছু সালাদ কিংবা লেবু—মুখের টেস্ট ফিরে আসে আর কী। কিন্তু যত দোষ নন্দঘোষের মতো, পর্নোগত প্রাণ বলতে ব্যাচেলরকেই ধরে নেয়া হয়। এ-ধারণা সত্য নয়। সত্য-মিথ্যার ঊর্ধ্বে অনেক ব্যাচেলরেরই একটা মত ধরা পড়ে যে—পর্নোতে ব্যাচেলরেরই জন্মগত অধিকার। এও একধরনের চরম ব্যাচেলরি। যে ব্যাচেলরের লাইব্রেরি পর্নোতে আকর্ণ ঠাসা, কারো মতে তিনিই হচ্ছেন সার্থক ব্যাচেলর—পড়েন, দেখেন, নাড়েন-চাড়েন, 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের লোক। যথার্থ ব্যাচেলরি। শুধু ঐটুকুই নয়—সত্যিকারের ব্যাচেলরি একজন ব্যাচেলরের চলায়-ফেরায় কায়দা-কানুনে হারে-সারে নানাভাবে ফুটে ওঠে। আসবাব থেকে পোশাক-আশাক সবতাতেই।

কোনো-কোনো ব্যাচেলর যে-রেটে সিগেরেট খান তাতে ঘরময় যত্রতত্র ম্যাচের কাঠি, দেশলাইয়ের খোল, আধপোড়া আর পুড়ে-যাওয়া সিগেরেটের ছাই। এ্যাসট্রে অর্থাৎ ছাইদান আছে, তবে সেই ছাইদানে তো আর অটোমেটিক পা ফিট করা নেই যে, ব্যাচেলর ঘরের যখন যেদিকে যাবেন, গুরুর চেলার মতো একবার ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ, আরেক দফা ও-কোণ থেকে সে-কোণ পায়ে-পায়ে ঘুর-ঘুর করবে আর তাকে-তাকে থাকবে গুরু কখন তার কুণ্ডে ফুঁকে-ফুঁকে ভস্ম ঝাড়বেন। আর গুরু ব্যাচেলরও জানেন যে, এ্যাসট্রে কোনো রিস্টওয়াচ নয় যে, হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে হবে। এ্যাসট্রে টেবিলের জিনিশ, টেবিলে থাকবে—তাতে ছাই, কাঠি, পোড়া সিগেরেট যে গুঁজতেই হবে এর কোনো মানে কোনো-কোনো ব্যাচেলরের বিবেচনায় মেলে না। সেভাবে, এই বিশ্ব যদি দিনে-দিনে মানবজাতির এ্যাটমিক এ্যাসের ট্রেতে পরিণত হতে পারে তবে আমার এই ঘরণীহীন ঘর কেন পারবে না তার চতুষ্কোণ মেঝেতে আমার সামান্য সিগেরেটের ছাই বুক পেতে নিতে। এই দার্শনিক দৃষ্টি থেকেই বোধহয় অনেক ব্যাচেলরের ঘরই এ্যাসট্রে টেবিলে যেটা, সেটা নগণ্য রেপ্লিকা মাত্র।

ঘর যত ধরবে তার বেশি সেই ঘরেরই রেপ্লিকা ধারণ করবে কীভাবে! রেপ্লিকা এ্যাসট্রেটি কি পারবে দিনভর খাওয়া সিগারেটের প্যাকেট, লেপ থেকে বেরিয়ে আসা তুলো, ছেঁড়া কাগজ, বাসের টিকিট, পুরোনো মোজা, কাটা নখ, ফটো বাধ, ডালপুরির ঠোঙা, এইসব টুকিটাকি বক্ষে ধারণ করতে? ঘর পারবে। ঘর পারবে ছেঁড়া চটি থেকে ফুটো ঘটি পর্যন্ত। ব্যাচেলরের ঘর বলে কথা। দেয়ালের পেরেকে ঝুলছে আয়না—ভাঙা। তাতে মুখ দেখা না-যাক, নিখুঁত শেভ করা যায় বৈকি। নইলে ঘরের মালিক করেন কী করে। কোনো চেয়ারের তিন পা—বসা না-যাক, দিব্যি ওতে দাঁড়িয়ে ফিউজ বাল্ব খুলে নিউ বাল্ব লাগানো চলে। আপনি বিবাহিত—কসরত করে ঐ কায়দায় লাগাতে গেলে উল্টে পড়ে যাবেন, কিন্তু বিশেষ-বিশেষ বাছাই কথা ব্যাচেলর পড়বেন না। উনি পড়াশোনা করতে পারেন বটে কিন্তু পড়েন না। লপাস করা, ধপাশ করা কি এক? তিনি ধপাশ করে পড়েন না এই কারণে যে, পড়লে তাকে এই ধরণীতে ধরার লোক নেই। কিন্তু আপনার তো আছে—বউ! এবং সেই আশায়ই তো পড়তে চান যে, সে এসে ধরবে—পুরুষের সব সাধ কি আর পূর্ণ হয়?

মোদ্দাকথা, ব্যাচেলররা পড়াপড়ির মধ্যে নেই। এম. এ. পড়বেন, প্রেমে পড়বেন কিন্তু আপনার মতো বিয়ে করবেন বলে সবকিছু নিয়ে পড়বেন না। যদি উনি আপনাকে ফলো করে একবার বিয়ের ফাঁদে পড়ে সংসার ফাঁদতেন, তবে তার ঘরও হত ঝকঝকে-তকতকে, লেপাপোছা-ধোয়ামোছা। কাগজ-পত্র, বই-বিছানা, লেপ-তোশক, আয়না, চেয়ার-টেবিল, হাঁড়ি-পাতিল, ড্যাগ-ডেকচি যেটা যেখানকার সেটা সেখানে থাকত। নিজে রেঁধে খেতে হত না, নিজে কেচে পরতে হত না। জ্বরের ঘোরে নিজে উঠে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খাবার যন্ত্রণা সইতে হত না। দরজায় এসে নক করলে—তা সে যত রাতই হোক—ভেতর থেকে খুলে দেবার থাকত কেউ, বলত, 'এসো আমার ঘরে এসো আমার ঘরে।' কিন্তু ব্যাচেলর তার নিজের ঘরের তালা নিজেই খোলেন—'এসো গো' বলে কেউ ভেতর থেকে খুলে দেয় না। ঘর তার নিজস্ব বলেই— এই ঘরের সন্ন্যাসই তার আদর্শ। এই তার ভালো লাগা, এই তার ভালোবাসা। নিজের চাবি দিয়ে নিজের দরজা খোলা। কোনো-কোনো ব্যাচেলরের নিজেকে চেনার জন্যে বিরতিহীন এই আত্মানুসন্ধানী রতিক্রিয়া। নিজেরই উচ্ছিষ্টে নিজের সৃষ্টিছাড়া জীবন হাতড়ানো।

অনেকে বলবেন নিজেকে নিয়েই আছে, লোকটা স্বার্থপর। স্বার্থের মানে কি জানে সবাই? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে কেউ, আমি স্বার্থপর নই—কোনো দিন নিজস্বার্থে কোনো কিছু করি নি।—কেউ বলতে পারবে না। কোনো-কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহিতেরা স্বার্থত্যাগ করতে পারে হয়ত—কিন্তু যৌবনের ক্ষেত্রে নয়। তখন সব ভাবনাই তার নিজেকে নিয়ে। রাতে ঘুম হয় না, গা-গরম—শরীর জুড়োতে মন চায়—ভাবে—বিয়ে হবে শরীর জুড়োবে, যৌবন তৃপ্ত হবে—ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসা নিয়ে। আমাদের দু-জনের ভালোবাসার বাইপ্রোডাক্ট যে-সন্তান হবে, তারা একদিন মানুষ হবে, বুড়োবয়সে সেই মানুষ-হয়ে-ওঠা সন্তানরাই দেখা-শোনা করবে। চমৎকার প্রিপ্ল্যান্ড্ নিশ্চিন্ত জীবনযাপন! ব্যাচেলরের জীবনে এই নিশ্চিন্তি নেই। বুড়োবয়সে ভবিষ্যতে কী হবে, কে তাকে দেখা-শোনা-তদারক করবে তার কোনো ঠিক নেই।

সংসার বাঁধে নি বলেই যে সব ব্যাচেলর সংসারের বাইরে তাতো নয়—অনেকে আছেন—যারা নিজের নয়, অন্যের সংসারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। বাবা-মা যদ্দিন ছিলেন, ছিলেন ভালো। তাদের কেন্দ্র করে জীবনের একটা মানে দাঁড় করায় মনের সামনে। বাপ-মার আয়ুর পাখি খাঁচা ছাড়তেই ভাই-বোনের সংসারে—নিরালম্ব উল্টো পিরামিড দশা। বোনদের বিয়ে হয়ে গেলে, আরো ভীষণ মারাত্মক অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় ছোট কিংবা বড় ভাইয়ের সংসারে। মিটসেফ খুলতে সাহস হয় না কী—জানি ভাই-বৌ কী ভাবে। ঠাকুরপো বা ভাশুর, সে যে পোস্টেই সংসারে থাকুক-না কেন—সঙ্কোচ হয়। সংসারে থেকেও সংসারের বাইরে। অথচ বাঁধনও তেমন আলগা নয়। ছোট ভাইয়ের বৌয়ের শাড়ি লন্দ্রিতে দাওরে—বিজলি গেছে, মিস্ত্রি ডাকোরে, বাজারটা করোরে, র‍্যাশনটা তোলরে, ওয়াসার বিল বাকি, আজকেই দিতে হবে, টিভির লাইসেন্স রিনিউ করতে হবে—বাদলার দিনে মুড়ি খাবার সাধ জাগল সংসারের সবার—যাও, গিয়ে মুড়ি আর পেঁয়াজ কিনে নিয়ে এসো গে—ছাতা কেউ এগিয়ে দেবে না যাবার মুখে—ব্যাচেলর বেচারিকে নিজেই নিজের শরীর বাঁচানোর গরজে নিতে হবে ছাতা অথচ সে-ই ব্যাচেলর ভাইটিই নিজের উদ্যোগে বিয়ে দিয়েছেন ছোট এবং বড় ভাই দুটিকে। নিজেদের বিয়ে হয়ে বিয়ানো যেই সারা—অমনি অতীতের সব কথা চেপে গেছেন সবাই। ঘুণাক্ষরেও ব্যাচেলর ভাইটির ব্যাচেলরি ঘোচাবার

চেষ্টা নেই। সংসারের উটকো ফাইফরমাশ খাটতে-খাটতে জান-কাবার হয়ে যাচ্ছে। মাসকাবারে টাকা ধরেও টানে। অথচ মাছের বেস্ট পিসগুলো গিন্নিরা তাদের কর্তাদের পাতে ঠেলে তুলে দেন—আবার ন্যাকামোও করেন সঙ্গে—এঃ হেঃ নান্টুদার জন্যে টুকরোটা রেখেছিলাম! নান্টু মানে ব্যাচেলরটি। নান্টুর মুখে টু-শব্দটি ফোটে না লজ্জায়। এরা বিয়ে করে স্বার্থপর হয়ে গেছে—তার পক্ষে অত নীচে নামা সম্ভব নয়। তাহলে তো ছোটভাইয়ের বিয়ের আগে নিজেই একটা বিয়ে করে নিতে পারত সে। সংসারের কথা ভেবেই না! ছোটভাইয়ের প্রেমের কথা ভেবেই না, তার এই ভালোমানুষী। সে তো ভাবতেই পারে নি, ভাই মানে যেখানে—সেখানে এমন বেঈমানি সম্ভব!

এখন নান্টু দেখছে দুনিয়াদারি। দাড়ি পাকছে, চুল পাকছে—কলপ লাগায় না ইচ্ছে করেই—ভাবে, দেখুক ভাই—লজ্জা হোক, হুঁশ হোক এই ভেবে যে, দাদার তো বয়েস হচ্ছে। তার তো বিয়ের জন্যে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যেই নান্টু দেখল লজ্জা তার ভাইয়ের নেই, তখন সে নির্লজ্জ ও একগুঁয়ে হয়ে সেলুনে ঢুকে ঘোড়ামার্কা কলপ লাগিয়ে এল এবং চেষ্টা করতে লাগল নিজের জন্যে নিজের বিয়ের। মাথায় যেই কলপ লাগাল, সংসারে ফুটন্ত তেলে যেন লুচি পড়ল। খলবল করে উঠল সংসার। বুড়ো বয়সে ভীমরতি দেখো না, বেহায়া নির্লজ্জ বিয়ে-পাগল হয়ে উঠেছে। সংসারের কোনো অভিজ্ঞতা নেই অথচ ছাদনা-তলায় যাবার সাধ। এ-কটা দিন যখন কাটিয়ে দিতে পারলে বাপু, তখন শেষ বয়সে আর কেন পরের মেয়েকে এনে কষ্ট দেয়া! ছেলে-পেলে হবে—তুমিও মরবে, তখন তোমার অপোগণ্ডগুলো সামলাবে কে শুনি? বেশ আছ মুক্ত পুরুষ, থাকো না তাই হয়ে!

নান্টু সাহেব এখন মনে-মনে হাসেন আর ভাবেন, হায়রে স্বার্থের পৃথিবী! মনের হাসিতে দুঃখের একটা সর ভেসে ওঠে। এখনই এ-সব বলছিল মন্টু, যখন আমি চলতে-ফিরতে পারব না তখন না-জানি কী অবস্থা করবি আমার! নান্টু সাহেব তবু চেষ্টা চালাচ্ছেন বন্ধু-বান্ধবদের ধরে শেষ জীবনের কথা ভেবে। বিয়ের প্রস্তাব আসছে—আবার ভেঙেও যাচ্ছে। রাবণের পতন তো শুধু রামের জন্যে হয় নি, বিভীষণের হাতও প্রধান ছিল সেখানে। ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেলেই লোকে ধরে নেয় বড়ভাই বিয়ে করবেন না, ব্যাচেলর থাকবেন। অতএব ব্যাচেলরকে রাঙাতে যত রঙ লাগে সবই লাগানো হয়ে গেছে নান্টু সাহেবের চরিত্রে। পাত্রীপক্ষের কেউ খোঁজ নিতে এসেছে। টের পেয়েই ঠোঁট চালিয়ে দেয়—দাদার কথা বিশ্বাস করে কেউ—ও পাগল মানুষ। আছে ভালো ঝাড়া হাত-পা— আমরা মশাই বিয়ে করে ফেঁসে গেছি; দাদা এদিকে ছেলে-মানুষ হলেও ওদিকে কিন্তু সেয়ানা। দাদার মতো অমন নেশা করে অত রাতে বাড়ি ফিরলে আমাদের বউ আমাদের আস্ত রাখবে—বলুন। পাত্রীপক্ষের লোকটি যেহেতু বিবাহিত, 'আমাদের বউ' বলতেই দলে ভিড়ে গেলেন ছোটভাইয়ের—তারপর? তারপর?

তারপর আবার কী!

না বলছিলাম, তিনি কি মদ খান?

ভাই তখন দাদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—মশায় আমাদের যখন দাদার মতো বয়েস হবে, তখন অত পরিমাণ মাল হজম করতে পারব বলে মনে হয় না। বোতলকে বোতল সাফ করে দিচ্ছে অত বয়সে। এত খাওয়া চাট্টিখানি কথা, ওর যেসব বন্ধু ওর সঙ্গে খায় তারা তো থ। কলপ দেয় বলে বয়েস বোঝা যায় না, তাই যারা তাকে জানে না তারা তো ভাববে ঠিকই

খায়। কিন্তু আমি তো ভাই, আমি জানি দাদার কী স্ট্যামিনা। অথচ দেখুন দাদা ব্যাচেলর মানুষ বলে তার নামে কত লোক কত আজেবাজে কথা বলে। আমার বিশ্বাস কি জানেন, যার জুয়া আর মদের নেশা আছে তার মেয়েমানুষের নেশা থাকতেই পারে না। খামকা দাদাকে বদনামি দেয়া। দাদা নাকি কোথায় গিয়ে ফষ্টিনষ্টি করে। আরে মশাই, দাদার কী দোষ—বিয়ে করে নি কামভাব তো জাগতেই পারে। তা বলে ভাড়াটে মেয়েদের সঙ্গে নাম জড়ানো। যারা জড়ায় জড়াক, তাদের মতো আমি তো আর চোখে দেখি নি।

নান্টুর বিয়ের স্বপ্ন শেষ। নান্টু সাহেব বললেন, ভাই সাংবাদিক আমার আসল নামটা লিখবেন না প্লিজ। বললাম, ভয় কী, আপনি তো সত্যি কথাই বলেছেন। বললেন, সত্যিকেও আমি ভয় করি এখন—মিথ্যাজীবন যাপন করছি তো। বাঁচবই বা ক'দিন। ওদের আমি দুঃখ দিতে চাই না!

জিজ্ঞেস করলাম—কাদের?

কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন—চোখে জল। বললেন, বিবাহিতদের।

অনেক ব্যাচেলর আছে যাদের বিয়ে হয় নি দৈবের কারণে। ভালোবাসার জোরে জীবন টেনে চলেছেন—মরণের পরে প্রেয়সীর দর্শন পাবে এই আশায়। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়—যে সময় আর কোনোদিন ফিরে আসবে না—সেই সময়কেই প্লেটনিক প্রেমের ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন। জয়ধ্বজা উড়ছে তাকে ঘিরে ভালোবাসায়। কিন্তু সেই ধ্বজাধারী ব্যাচেলরকে বাড়িওলা বাড়িভাড়া দিচ্ছেন না। দিতে চায় না কোনো বাড়িওলাই। ব্যাচেলরকে ঘর দিমু নিজের ঘর জ্বালানের লেইগা? বললেন বাড়ির মালিক খেদমত আলী তালুকদার—আমার ঘরে ইয়াং-ইয়াং তিন মাইয়া। কার লগে কী কইরা বসে ঠিক কী! সরল সিধা মাইয়ারা আমার—সাত চড়ে রাও করে না। কোন্‌দিন কী কইরা বইব—মাইয়ারাও কইব না ইজ্জতের সাওয়াল। বললাম—ভাই, রহমত সাহেব তো বৃদ্ধ লোক।

বাড়িওলা খেঁকিয়ে উঠে বললেন, 'বৃদ্ধলোক! বৃদ্ধলোকের কলা বোঝেন আপনে, জানেন পঁচিশ বছরের অবিবাহিত তরুণের চাইতে আশি বছরের ব্যাচেলর ডেঞ্জারাস। এরা এক-একটা কামরূপ এক্সপ্রেস।

'ভাড়া দেবেন না ওনাকে?' জিজ্ঞাসা আমার।

'দিমু না কেন, দিমু—আগে বিয়াশাদি কইরা আসুক—দিমু।'

রহমত সাহেবকে পাকড়াও করে বললাম, 'দেখলেন তো বিয়ে না-করার খেসারত? খামকা কেন যে বিয়ে করলেন না।'

'ঠিকই বলেছেন'—রহমত সাহেব আফসোস করে বলতে লাগলেন—'আগে বুঝিনি যে আমরা আসলে ভীষ্ম, কর্ণ, বিবেকানন্দ, যিশু নই—এই মহাপুরুষেরা দিব্যি বিয়ে না করে কাটিয়ে গিয়েছেন। আর আমরা যৌনতাপে অর্ধশুষ্ক হয়ে বারুদের মতো হয়ে আছি অনেকে—নারীভঙ্গিমার একটি স্ফুলিঙ্গ পড়ামাত্র জ্বলে উঠছি দাউ-দাউ। ব্যাচেলর রহমত সাহেবকে বেশ ক্ষুব্ধ উপলব্ধি করলুম। সারাজীবন ভালোবাসা পান নি, একটা ভালোবাসাও পাবেন না—কেউ দেবে না তাকে, এ কী হয় না-কি। বিবাহিত ভাইসব, আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি আপনাদের—'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগানের মতো আপনাদের একদিন শুনতে হবে, 'দুনিয়ার ব্যাচেলর এক হও' ধ্বনি। ভেবে দেখুন অবস্থাটা কোথায় দাঁড়াবে! হিমালয় পর্বত থেকে কাতারে-কাতারে নেমে আসবে সব নাঙ্গ সন্ন্যাসী,

দেশি-বিদেশি খৃস্টান মিশনগুলোর মহারাজারা সবাই এসে ধ্বনি তুলবে, 'ব্যাচেলরদের দাবি মানতে হবে,' 'তাদের ন্যায্য মর্যাদা ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও', 'অকারণে সন্দেহ করা চলবে না চলবে না', 'বিবাহিত নিপাত যাক,' 'দশপোলার বাপ নিপাত যাক,' 'বাসাভাড়া দিতে হবে, দিতে হবে'—কল্পনার চোখে ভেবে দেখুন পিলে চমকে উঠছে না?

আমি জানি অনেকে বলবেন, ছাই উঠছেন পিলে চমকে। চমকাবে কেন? বিয়ে করেছি বেশ করেছি—দরকার হলে আরো করব—তাই বলে ফালতু ব্যাচেলরদের ডরিয়ে চলতে হবে নাকি? ওদের শ্লোগানে কান দেবে কে? ওরা সংগঠিত হবে বলে তড়পাচ্ছেন তো খুব—জেনে রাখুন, যাদের নিজের কোনো গঠন নেই তারা করবে সংগঠন? সন্ন্যাসের দোহাই দিয়ে আন্দাজে কোনো আন্দোলনে ব্যাচেলররা নেমেই যদি পড়ে, তবে হদিস খুলে হাদিস দেখিয়ে দেব—স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে, 'বিবাহিত পুরুষের ঘুম অবিবাহিত পুরুষের এবাদত অপেক্ষা ভালো।' অন্যান্য ফরজ-এর মতো ইসলামে বিয়ে করাও একটা জরুরি ফরজ। ফরজ পালন না করে আন্দোলনে নামলে একটা ব্যাচেলরও আস্ত রাখব না।

মেরে ফেলবেন না-কি?

মেরে ফেলব কেন—ধরে-ধরে বিয়ে দিয়ে দেব। বলব, ব্যাটারা 'চন্দ্রাকোণার মটকি ঘি, খেলি না তো খেলি কী'— উলোর মেয়ের কুনকুনুটি, অগ্রদ্বীপের খোঁপা, মীর্জাপুরের নথ নাড়া আর গুপ্তিপাড়ার চোপা—খেয়ে দেখো—টক, ঝাল, মিষ্টি সংসারের স্বাদ একবার জিবে লাগলে আজীবন নাল ঝরবে ঠোঁটে। ব্যাচেলরি যাবে জন্মের মতো ঘুচে। আন্দোলনও বিলীন হবে বিলক্ষণ। সামান্য সংসারে যারা ডরায়—জানবেন, তাদের দিয়ে কিসসু হয় না। ব্যাচেলর থাকাই সার।

কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। ব্যাচেলররা সবাই সংসারের ভয়ে ভীত নয়, সমাজ এবং সংসারের অবস্থায় শঙ্কিত ওয়ে ওঠেন তারা। দায়িত্বজ্ঞানশূন্য বলে অপবাদ দেয়া হয় মিথ্যে করে। ব্যাচেলর যিশুখৃস্টকে কি দায়িত্বহীন বলবেন? সংসারের ভয়ে-ভয়ে ভীত বলবেন? মানব-সংসারের জন্যই তো তিনি ক্রুশে নিজের জীবন দিলেন। ব্যাচেলর স্বামী বিবেকানন্দকে সংসার-ভীরু লোক বললে সংসারীরাই হাসবেন—আমরণ মানবসেবার জন্য যিনি মহামানব খ্যাতি পেয়েছেন।

দুনিয়াতে কৃতীমান ব্যাচেলরের সংখ্যা নেহাত কম নয়। পশ্চিম বাংলার তিনজন মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন ব্যাচেলর। প্রফুল্ল ঘোষ, বিধান রায়, প্রফুল্ল সেন। বিধানচন্দ্র রায় ডাক্তার হিশেবে, সমাজসেবক হিশেবেও সুবিখ্যাত। জগন্নাথ কলেজের দীর্ঘদিন বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন অজিতকুমার গুহ—তিনিও ছিলেন চিরকুমার। শাহেদ সোহরাওয়ার্দীও তাই। কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল যুগের অধিনায়ক প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় আব্বাস মীর্জাও বিয়ে করেন নি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মেজাজ ফিরিয়ে দিয়েছেন যে দেবব্রত বিশ্বাস তিনিও ব্যাচেলর ছিলেন।

যে দেশে ধান ভানতেই বিয়ের গীত, সে দেশেই এরা শিরোধার্য এখনো। অতএব ব্যাচেলর মানে ভীরু কাপুরুষ, দায়িত্বহীন ভাবাটা ঠিক নয়। জীবনকে তো সবাই একইভাবে দেখছে। ব্যাচেলররা একটু আলাদা করে দেখুক না। তাদের ভালোবাসার ভিটেয় যদি ঘু-ঘু চরে চরবে—তাতে আমার-আপনার নাক গলানো কেন? কই, ব্যাচেলররা তো নাক গলায় না কিছুতেই।

গাও-গেরামের রাম-রহিম রোমেল, সে যে-ই হোক না কেন, না-পালিশ গেঁয়ো গলায় অহরহ একটি নালিশ গাইতে শোনা যায় বয়সকালে। বয়স যখন তেতে উঠছে ভিসুবিয়াসের মতো যৌবনের আঁচে, তখন ধারে-কাছের তেঁতুল গাছে উঠে বাপ কিংবা দাদার উদ্দেশে তোলে পুরোপুরি গানের তান। তানপুরা নেই, একতারা-দোতারা নেই, এমনকি প্যাথোজ সুরের বেহালার ছড়ও টানতে হয় না তাকে, তবু হায়-হায় করা বুকের ভেতর থেকে তেঁতুলের মগডালে অসহায়ভাবে বসে গ্রামবাসীদের জানান দিয়ে উচ্চগ্রামে গলা তোলে— 'দাদা আমায় বিয়া করায় না।'

হানিফ সংকেত [১৯৫৮ —]

আত্মকাহিনী

১. ট্রাকের আত্মকাহিনী

আমার নাম ট্রাক। ঢাকার ধোলাই খাল এলাকায় জন্ম। তবে কখন কোন তারিখে আমার জন্ম হয়েছিল তা আমি কী করে বলব? আমি কি আর সন তারিখের হিসাব জানি? তবে দুই নম্বর তক্তা দিয়ে লোহার পেরেক ঠুকে যখন আমার পিছনে একটি শরীর তৈরি করা হচ্ছিল তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার জন্ম কত যন্ত্রণাদায়ক।

আমার গায়েও সুকুমার বৃত্তির চর্চা করা হয়; অনেক কথা লেখা হয়, অনেক শিল্পকর্ম স্থান পায়। যেমন : সংকেত দিন, থামুন, ভেঁপু বাজান, সমগ্র বাংলাদেশ, পাঁচ টন। ট্যাংকির গায়ে লেখা থাকে : জন্ম থেকে জ্বলছি। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে বিরাট একটি ঈগল পাখি আঁকা হয়। এর যে কী অর্থ তা আমার জানা নেই। যদিও আমার গায়ে 'ভেঁপু বাজান' লেখা থাকে তথাপিও আমার মতো আমার অনেক জাতভাইয়ের শরীরে কোনো ভেঁপুই নাই। ব্যাটারি খরচ হবে বলে মালিক সেটা লাগায় না। তাই হেলপার আমার গায়ে থাপ্পর মেরে-মেরে 'সাইডে' 'সাইডে' বলে। আমার খুব কষ্ট হয়। শরীরেও ব্যথা পাই। হেলপারের জন্যও খারাপ লাগে— এভাবে চিৎকার করতে থাকলে ওরতো ভোকাল কর্ড ছিঁড়ে যাবে। আহারে মানুষ, শুধু একটি ভেঁপু লাগালেই কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

আমি যেন তাদের হাতের পুতুল, যখনই ইচ্ছা হয় আমাকে নিয়ে খাদে ডোবায়, গর্তে চলে যায়। রাস্তায় যখন চলি তখন রিকশা স্কুটার ধাক্কা দেয়াসহ শিশু পথচারীদের পিষ্ট করে নিয়ে যাই। আইল্যান্ড আর হাইল্যান্ড কোনো কিছুই আমি বুঝতে চাই না। অথচ আপনারাই বলুন এর জন্য দায়ী কে? আমি না আমার চালক?

আমাকে যারা চালায় তারা কোনো গতিসীমা মানে না। অসীমের পানে যেন ছুটতে চায় তারা। কেন আমার এই জাতির ব্যাপারে তো আপনারাই আবার কৌতুক করেছেন। স্পিডোমিটার ছাড়া আমাকে চালাচ্ছিল এক চালক। কত মাইল বেগে আমাকে চালাচ্ছে সে, তা বোঝে কী করে জিজ্ঞেস করাতে উত্তরে সে বলেছিল, 'যখন শুধু বনেট কাঁপে তখন ২০ মাইল, যখন বনেট দুই দরজাসহ কাঁপে তখন ৪০ মাইল, যখন পুরো বডি কাঁপে তখন ৬০ মাইল, আর যখন আমিসুদ্ধ কাঁপি তখন ৮০ মাইল।' এবার আপনারাই বলুন এইধরনের চালক যদি আমাকে চালায়, তাহলে আমার বদনাম হবে না কেন?

ইদানীং আমি যেন তারকা হয়ে গেছি, পত্রপত্রিকায় আমাকে নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। আমাকে 'ঘাতক' 'যন্ত্রদানব' আখ্যা দেয়া হয়েছে। আমার নামে কবিতা লেখা হচ্ছে। সে-সব কবিতা আবার আবৃত্ত হচ্ছে ক্যাসেটে, টেলিভিশনে। কবিতার কটি লাইন শুনুন—

আমি দুরন্ত, আমি দুর্বার
আমি ভেঙে করি সব চুরমার।
আমি ঘাতক আমি দানব
আমি পিষ্ট করি মানব।

কিন্তু এর জন্য দায়ী তো আমার চালক। আমার নিয়ন্ত্রক। কৈ তাকে নিয়ে তো কেউ কিছু বলে না ! তাকে কেউ বিচার করে না। যখনই তাকে নিয়ে কিছু করা হয়, তাদের দাবির মুখে আবার কয়দিন পরে তা তুলে নেয়া হয়। কিন্তু আমার বাকশক্তি নেই। কথা বলতে পারি না। কোন প্রতিবাদ করতে পারি না। তাই আমার এত কষ্ট। এত অপবাদ।

আমার দুঃখের কথা কী বলব। যারা আমাকে চালায় তারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আমাকে ব্যবহার করে সংসার চালায় অথচ দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আমাকে একা বিপদে ফেলে পলাতক হয়। আর মারমুখী জনতা এসে আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ এসে সে-অবস্থাতেই আমাকে গ্রেফতার করে। অন্য গাড়ির সাথে বেঁধে টেনে-টেনে থানায় নিয়ে যায়। হে বিধি, কার সাজা কে পায় ! আমি কি কম কাজ করি—মালবহন তো করিই ; তার ওপর আন্দোলনের মিছিলে আমার সংখ্যা যত বেশি হয় অর্থাৎ ট্রাক-মিছিল যত বড় হয়, তার প্রচার তত বেশি। ধর্মঘটের সময় আমাকে রাস্তায় আড়াআড়িভাবে রেখে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো হয়। আমি অপবাদের স্বীকার হই। কাগজে আমার ছবি ছাপা হয়। অথচ যারা এর জন্য দায়ী, তার ছবি তো কখনো দেখি না। কেউ কেউ টিপ্পনী কেটে বলে আমাকে নাকি আজকাল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাই অকাতরে আমি নাকি মানুষ মারছি। বলুন এই অপবাদ কি সহ্য হয় ? মাঝে মাঝে হেলপার আমাকে চালায়। আমি জানি এক্ষুনি সে খাদে যাবে। কিন্তু আমার-যে বাকশক্তি নেই। কিছু বলতে পারি না। মাঝে মাঝে রাস্তায় আমার সামনের দিক কাত হয়ে থাকে। মনে হয় এই বুঝি উল্টে যাব। মালিক আমাকে মেরামত করে না। শোচনীয় অবস্থা হয়ে যায়।

এখন সকাল দশটার আগে আমাকে শহরে ঢুকতে দেয়া হয় না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে— যতদিন আমার চালককে ঠিক করা না হবে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করা না হবে, এবং আমার মালিক পয়সা খরচের ভয়ে আমার অসুবিধাগুলো, বিশেষ করে ইঞ্জিনের অসুবিধাগুলো মেরামত না করবে ততদিন এ অবস্থা চলতেই থাকবে। কারণ ১ ঘণ্টা চলেও আমার দ্বারা ১০ ঘণ্টার দুর্ঘটনা ঘটানো সম্ভব এদের মাধ্যমে। আর আমার ভাগ্যেও ঘাতক-যন্ত্রদানব অপবাদ জুটতেই থাকবে। সে অপবাদের জন্য দায়ী আমি নই। আপনারা— হ্যাঁ, আপনারা যারা মানুষ এবং আমার প্রভু, তারাই।

২. টেলিফোনের আত্মকাহিনী

মৃত কখনো জীবিত হয় শুনেছেন? শোনেন নাই। শুনলেও না-শোনার ভান করবেন। কারণ আমার জীবনমরণ নিয়ে আপনারাই ছিনিমিনি খেলেন। আপনাদের উপর আমার প্রচণ্ড রাগ হয়। পরক্ষণেই আবার চিন্তা করি আপনাদের উপর রাগ করে লাভ কী? আপনাদের আবার চামড়া মোটা। অনেকটা গণ্ডারের মতো। একটি পশুর সাথে তুলনা করলাম বলে খেপবেন না। সেদিন একটি জাতীয় দৈনিকেও উপসম্পাদকীয়তে লিখেছে, এই সমাজে দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ প্রাণীর পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই মারজিনাল—এ-কথা না মেনে উপায় নেই। এই সাহসেই

বললাম। আপনাদের মধ্যেও কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন যারা ভালো। আমি আসলে খেপেছি আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের ওপর। ভাবছেন ওর ওপর চ্যাতলাম ক্যা? উনিই আমাকে উদ্ভাবন করেছেন। এখন নিশ্চই বুঝতে পারছেন আমি কে?

হ্যাঁ, আমি টেলিফোন। আমার জীবনের কিছু কথা আপনাদের শোনাব বলেই আমার আত্মকাহিনী হাজির। দুরালাপনী বলি নাই বলে রাগ করলেন? সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর কথা আপনারাই তো বলে আমাকে টেলিফোন বলে ডাকেন। আমার দোষ খুঁজবেন না। কথায় কথায় বলেন টেলিফোন খারাপ। আমি কি খারাপ? না আপনারা আমাকে খারাপ করেন? টেলিফোন ডেড। মানলাম আমি ডেড। কয়দিন পরেই তো আবার জীবিত হই। কেমন করে হই? সেটা আপনারা জানেন। এ যেন ভানুমতির খেল। তবে যে কয়দিন মৃত থাকি সে কয়দিন ভালোই থাকি। চালু থাকলে মনে হয় আমার মাধ্যমে দুজনের জায়গায় কয়েকজন কথা কয়। অপনারা নাম দিছেন ক্রস। কুকুর পাগল, প্রেম পাগল, খেলা পাগল, ফুল পাগল, খিচুড়ি পাগল, সিনেমা পাগল ইত্যাদি ম্যালা পাগলের সন্ধান পাওয়া যায় এই ক্রসের কল্যাণে। মাঝে মাঝে শুনি ঘুসের আলাপ। পছন্দমতো হয় না দেখে কত সাহেব সরকারি অফিসে আমাকে খট্টাশ করে রেখে দেয়। আমার শরীর বেশ কয়দিন ম্যাজ ম্যাজ করে। আলেকজান্ডার ভাই যদি ওষুধের ব্যবস্থা করত, তাইলে কিছুটা রেহাই পেতাম। মাঝে মাঝে কেউ কেউ বলে টেলিফোনটি অবৈধ—আরে আমি অবৈধ, না, সংযোগটা অবৈধ। এই সংযোগ আপনারাই দিয়েছেন।

আমরা যারা ব্যক্তিগত খরচে বাসভবনে থাকি তারা কম ব্যবহৃত হই। আবার ঐ ব্যক্তি যখন আমাকে সরকারি অফিসে পায়—তখন আমার আদর যেন উথলে ওঠে। আমাকে কাছে টেনে সারা শহরে যত বন্ধু-বান্ধবী আছে সবার সঙ্গেই একবার কথা বলে।

আমার কাছে উঁচুনিচু কোনো ভেদাভেদ নেই। যে যার সাথেই আলাপ করুক-না কেন সম্বোধনটা 'হ্যালো'ই বলতে হয়। যদিও অতিরিক্ত স্টাইলে মাঝে মাঝে হ্যালোকে হাল্যা, হালু, কিংবা আল করে ফেলেন। অপবাদে অপবাদে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।

কয়দিন আগে কাগজে দেখলাম একটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়েছে আমার। সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে, 'টেলিফোনের শেষকৃত্য'।

এই ব্যাপারে লেখা হয়েছে—টেলিফোন লাইন বরাদ্দ দেওয়া ও নাম্বার দেওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ টালবাহানা কিংবা বামহাতের কারবারের বিষয়টি বন্ধ হওয়ার পরও টেলিফোন বিলের ক্ষেত্রে যে-প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, তা সম্ভবত সকল অসদাচরণকেই অতিক্রম করে যায়। এইখানেই শেষ নয়—হেডলাইন আসে : সমস্যা ও অব্যবস্থার বেড়াজালে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, সমস্যাপীড়িত কয়েকটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। ময়মনসিংহে টেলিফোন গ্রাহকদের দুর্ভোগ আর মিরপুরেরটা তো আছেই। এ ছাড়াও আমরা যারা ৩ ও ২ দিয়ে শুরু হয়েছি তাদের পেরেশানি দেখলে দুঃখও হয়, কান্নাও পায়। কিন্তু করার কিছুই নেই। আমি যেন বাঁদর! আপনারা ডুগডুগি বাজান, আমি নাচি। সেই ডুগডুগি বাজানেওয়ালাগো কিছু কথা জিজ্ঞেস করি—রাস্তায় আমার যে তার টাঙানো থাকে, খুঁটি থাকে, এগুলো চুরি করে কে? নাম্বার নাই, সেট নাই তবুও হাজারটা ডিমান্ডনোট ইস্যু হয় কার আন্ডারপ্রেসারে? কেউ দুই বছরেও লাইন পায় না, আবার কেউ দুইদিনেও পায় কীভাবে?

আমার মৃত্যুর খবর জানিয়ে যদি কেউ অভিযোগ দেয় তাহলে কী বলেন তা তো আমি জানি। সেই একই কথা—লাইন খারাপ, কেবলে পানি ঢুকছে, সুইচ রুমে দেখেন, টেস্ট

রুমে জানান ইত্যাদি। বিল এলে বলেন কম্পিউটারের রিডিং, কোনো ভুল নেই। আবার ৫০০০ টাকার টেলিফোনের বিল ৫০০ টাকাও হয়। সেটা কোন কম্পিউটারের রিডিং? নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপান কেন? কম্পিউটারকে খালি খালি অপবাদ দেবেন না। তাহলে সেও একদিন আত্মকাহিনী নিয়ে হাজির হয়ে যাবে। অবশ্য আত্মকাহিনী বলেই বা লাভ কী? সেই যে আপনারাই ট্রাকের আত্মকাহিনী শুনেছিলেন, কিন্তু তারপরও ৯ জন মারা গেল ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে। ফেনীতে মারা গেল তরুণ ছড়াকার হোসেন আনোয়ার। আপনারা কী করছেন?

আমার কথাই ধরেন না—আমাকে পরিচালনা যারা করে, খালি তাদের দোষ দিয়ে লাভ কী? যারা ব্যবহার করেন তারাও আমার অপবাদের জন্য দায়ী। বেহুদা রাত বারোটায় মানুষের বাসায় ক্রিংক্রিং শব্দ করে উঠি অন্যের প্ররোচনায়। একবারও ভাবি না ঐ বাসায় একটি অসুস্থ শিশু কিংবা বৃদ্ধ থাকতে পারে। আমার মাধ্যমে ঘুসের পরিমাণ জেনে, চাকরির সুপারিশ করে আমাকে পাপী বানান আপনারা। কেউ কেউ আছে যারা মানুষকে বিরক্ত করার জন্য আমাকে ব্যবহার করে। রং নাম্বার বলে আবার রেখে দেয়। তারকারা রাতদুপুরে কিছু কিছু ব্যক্তির অত্যাচারে টিকতে না পেরে আমার রিসিভার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আমার মাধ্যমে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। কত জরুরি আলাপের সময় নাবালক শিশুকে দিয়ে টেলিফোন ধরানোর ফলে আলাপ তো দূরে থাক, শিশুর ছড়া শুনতে শুনতে আমার উপর বিরক্ত হয়ে পড়েন।

অথচ আমি কত উপকার করি। আপনাদের আমি 'স্ট্যাটাস সিম্বল' হয়ে ঘরের শোভা বর্ধন করি। জীবনে ছাপার অক্ষরে যার নাম ওঠেনি আমাকে নিলে ইয়া মোটা বইতে নম্বরসহ আপনার নাম ওঠে। শহরের একজন নম্বরী–লোক হন আপনি। ফ্যাশনের জন্য আমি যার ঘরে থাকি, সেই এলাকার দুই–তৃতীয়াংশ লোক আমার নম্বর দিয়ে দেয় তার নিজের বলে। যার ফলে ঐ গ্রাহক বেচারার নতুন কাজের লোক রাখতে হয় সবাইকে ডাকার জন্য। যদি ডেকে না দেন তাহলে ঝগড়া হবে। কারণ কাণ্ডজ্ঞান জিনিসটা আপনাদের কম আছে।

একটিমাত্র ফোন করার জন্য সবাই আপনার দ্বারস্থ হয়। আপনার বয়স যত কমই হোক না কেন, আমাকে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনে ভাইজান থেকে চাচা, নানাও বলতে পারে। 'স্বার্থের শৃঙ্খলে বাঁধা' অখিল সংসার। অতএব বুঝতেই পারছেন!

বিভিন্ন রঙে তারবিহীন অবস্থায়ও আমাকে পাওয়া যায়। এম্বুলেন্স, ফায়ার ব্রিগেড, ডাক্তার, পুলিশ, জরুরি সময়ে আমার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। কলেজ পড়ুয়া মেয়েটি হয়তো বাসায় ফিরছে না—খুব চিন্তিত আছেন, হঠাৎ আমি বেজে উঠলাম—মেয়ে, 'আব্বা আমার জন্য চিন্তা কর না। আমি শামীমের সাথে চলে গেলাম।' কিছুটা আশ্বস্ত, কিছুটা চিন্তিত হলেন। ভিজিটিং কার্ড ছাপাবেন, আমার নম্বর না পেলে যুৎসই হয় না। আমার মাধ্যমে মাঝে মাঝে জলোচ্ছ্বাসের জলপ্রপাতের এবং বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ শোনা যায়। খস্ খস্, ঘর ঘর ইত্যাদি। ইদানীং আন্তর্জাতিকভাবে আমি বিভিন্ন আলাপ ছাড়া শুভবিবাহও করিয়ে থাকি। কত কাজের কাজি আমি। দুটি বাঘমার্কা সিকি দিয়ে জনগণ আমাকে ব্যবহার করে। আমি জনগণের সেবা করি।

আর আপনারা যারা জনগণকে ব্যবহার করেন তারা জনগণের জন্য কী করেন? একটু হিসাব করে দেখছেন কখনো। হে বিধি! তুমিই জানো এর জবাব!

৩. মাইক্রোফোনের আত্মকাহিনী

শিশুকালে কিছু প্রবাদবাক্য শুনেছিলাম—যার মধ্যে একটি ছিল : সদা সত্য কথা বলিবে, কখনো মিথ্যা বলিও না। কথাটি সুন্দর। এই সুন্দর কথাটি যে কত অসুন্দরভাবে প্রকাশ পেতে পারে তার প্রমাণ আমি। হয়তো কেউ বলবেন, লজ্জা করে না এমন অকপটে এসব কথা জনগণকে বলতে? কার লজ্জা করবে? সেটা দেখেছেন? আমি একটি যন্ত্র! যন্ত্র বলেই বুকে আমার যন্ত্রণার পাহাড়। কারণ আমাকে চালান আপনারা, মানবসমাজ। হ্যাঁ, আমি মাইক্রোফোন বলছি।

নিজের ঢোল নিজে পেটাতে চাই নি। কিন্তু তা না করলে যে আপনাদের সৃষ্ট মিথ্যে-অপবাদ আমার উপরেই আসবে। আমার জন্মের পেছনেও আপনাদের দুষ্টবুদ্ধি কাজ করেছে। দুষ্টবুদ্ধি বলতাম না। আপনারা ভালো কাজের চাইতে খারাপ কাজে আমাকে অনেক বেশি ব্যবহার করছেন। সৃষ্টিকর্তা আপনাদের কণ্ঠ দিয়েছেন। দিয়েছেন ধ্বনি। এক-একজনের কণ্ঠ এক-একরকম দিয়েছেন। সেই কণ্ঠে যেন আর হচ্ছে না। গগনবিদারী চিৎকার করে পৃথিবীটাকে জানাতে হবে আপনার কর্ম। আপনি কী করছেন, কী দিচ্ছেন জাতিকে। কিন্তু একবারও কি ভেবেছেন—যা বলছেন, যা করবেন, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তার কতটুকু আপনারা পালন করছেন। জানি ভাবেন না। যিনি ভাবেন তার আমাকে প্রয়োজন হয় না। সে নীরবে নিভৃতেই কাজ করে যায়। মাঝে মাঝে আপনাদের ভণ্ডামি দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক-উ-উ করে উঠি। আপনারা তারস্বরে চিৎকার করে ওঠেন, ঐ মিয়া মাইক ঠিক করেন। কোনটা মাইক কোন্‌টা মাইক্রোফোন আর কোনটা লাউডস্পিকার সে সম্পর্কেও দেখছি আপনাদের ধারণা কম। আমি ভীষণ কষ্ট পাই যখন দেখি হাজার হাজার জনতা তপ্ত রোদে বসে আছে, আর তাদের সামনে ফ্যাঁসফ্যাঁসানো গলায় জনতার স্বার্থে আমরা-বলে বক্তৃতা দিচ্ছেন। কেউ গমের হিসাব চান, কেউ চিনির হিসাব চান, কেউ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি চান। সবার এক কথা, 'আমি ক্ষমতায় গেলে সব করে দেব'।

আমার খুব হাসি পায়। মাঝে মাঝে কান্নাও পায়। মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। কারণ আমি সকল আমলের সাক্ষী। সবাইকেই দেখেছি, সবার কথা শুনেছি। কে কী করেছেন জানি। তাইতো বলি, সদা সত্য কথা বলা কি কখনো এদের দ্বারা সম্ভব হবে না? আমাকে ব্যবহার করছেন অথচ চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছেন। চিৎকারই যদি করবেন তাহলে আর আমাকে ব্যবহার করার প্রয়োজন কী? দিন দিন আপনাদের তেজ যেন বেড়ে যাচ্ছে। মিথ্যার বেসাত করার জন্য আমার লেটেস্ট টেকনোলোজিতে হাত দিয়েছেন। ইদানীং পি.এ. সিসটেম, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের আমদানি হয়েছে।

ও, আর একটি কথা মনে পড়েছে। ইদানীং আবার আপনাদের একজনকে ব্যবহার করে তৃপ্তি হয় না, ৪-৫ জনকে সমানে ব্যবহার করেন এক সাথে। কারো কারো এত তেজ যে চিৎকারের দাপটে ফ্রিকোয়েন্সি সমস্যা হয়ে যায়। কখনো আপনাদের মুখনিঃসৃত থুতুতে আমার রিসিভিং পাওয়ার নষ্ট হয় অথচ আপনাদের পাওয়ার যেন বেড়ে যায়। আমরা তো মেকানিক্যাল, আপনাদেরও না আমার ভীষণ মেকানিক্যাল মনে হয়। হৃদয় বলতে যে বস্তুটি থাকে ওটা আদৌ আপনাদের আছে কিনা আমার সন্দেহ। নইলে আমাকে ব্যবহার করে অসহায় লোকদের জন্য চাঁদা তুলে আপনারা অনেকেই নিজের আখের গোছান? জানি না আপনাদের কেন এই প্রতারণা!

আচ্ছা, আপনারা এত বেহায়া কেন বলেন তো? যা করবেন না, তা বলেন কেন? এই মিথ্যার ঘানি টানতে টানতে তো আমার অবস্থা শোচনীয় হয়ে যাচ্ছে। 'ভাইসব' বলে বিরাট সম্বোধন করে যেসব কথা উচ্চারণ করেন, তাতে তো মনে হয় না যে আপনারা আদৌ কাউকে ভ্রাতৃ সমতুল্য মনে করেন। কেউ কেউ আবার আমাকে নিয়ে টিপ্পনীও কাটে—'দেখ মাইকিং শুরু হয়েছে।' আমার মাধ্যমে যারা মাইকিং করেন দোষটা তো তাদের। আমাকে টিটকারি দিয়ে লাভ কী। তবে এটা সত্যি যে, কোনো কোনো সময় আমার কদর খুব বেড়ে যায়। কার আগে কে আমাকে নিয়ে চেঁচাবেন সেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। সময়টা হচ্ছে ভোটের সময়। সবাই চেঁচাচ্ছে 'আমার ভাই তোমার ভাই অমুক ভাই অমুক ভাই'। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এই ভাইয়েরা মিলেমিশে যা করেন তা হচ্ছে যুদ্ধ। তখন আমার হয়ে যায় সাংঘাতিক করুণ দশা। কেউ আমাকে ছিনিয়ে নেয়, কেউ স্পিকারটা ভেঙে ফেলে। টানা-হেঁচড়া তো আছেই। আমি যার উপর ভর করে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি সেই স্ট্যান্ড দিয়ে একে অন্যের মাথা ফাটাতে কসুর করেন না আপনারা। আপনাদের হিংস্র উন্মত্ততায় সত্যি আমি কষ্ট পাই।

কী পেলাম আর কী পেলাম না তার হিসাব তো আমি করি না। কিন্তু কী ছিলাম, হিসেব করে অন্তত আমার প্রতি একটু যত্নবান হন। আমি কি আপনাদের কম উপকার করি? আপনাদের মিথ্যা বুলি উচ্চস্বরে লোকজনদের শুনিয়ে পাপের ভাগীদার হয়ে যে উপকার করছি, সেটা না হয় নাই বললাম। বলতে চাই না, কারণ পরোক্ষভাবে তাতে অসহায় সরল মানুষের অপকার করা হয়। রক্ষে যে আমি স্বজ্ঞানে এটা করছি না। কিন্তু ঐ যে 'হারানো বিজ্ঞপ্তি', ছোট ছোট হকারদের বাতের বড়ি আর বামের পাবলিসিটি, ফিল্মের পাবলিসিটিতে সাহায্য করি, সেদিকটা তো অন্তত একটু বিবেচনা করতে পারেন। ভোরের আযানে সবার ঘুম ভাঙিয়ে দেই। মনের দিক থেকে আমি পবিত্র। আসলে আপনারাই নানা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে আমাকে অপবিত্র করে ফেলেন।

আর্ট কালচার লাইনে তো আমি আছিই। শিল্পীর যা কণ্ঠ আছে তাকে আরো সুন্দর করে তুলি। আমার ছোট ভাই পি.এ. সিস্টেম তো আপনাদের গলাকে অনেক উন্নত করেছে। আমি যেহেতু সিনিয়ার, তাই পি.এ. সিস্টেমটাকে ছোট ভাই বললাম। আপনাদের মধ্যে এমন শিল্পীও আছেন যাদের আমি না থাকলে শিল্পী হওয়াও দুঃসাধ্য ছিল।

অনেক কথা আছে এই বুকে আমার। কত আর বলব। শুধু একটা অনুরোধ করব, আমি জড় পদার্থ, প্রাণ নেই। আপনাদের যাদের প্রাণ আছে তারা প্রাণহীন কাজ করবেন না। মানুষকে আমার মাধ্যমে ধোঁকা দেবেন না। সদা সত্য কথা বলতে চেষ্টা করবেন। অবশ্য এও বুঝি, মিথ্যা বলা এখন স্বভাব হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ করে সত্য বলতে পারবেনও না। তবুও চেষ্টা করতে দোষ কী! সদা সত্য কথা বললে ফল পাবেনই।

আরেকটা কথা বলতেই হয়, আমাকে সামনে পেলে আপনাদের অনেকেরই সময়জ্ঞান থাকে না। মনে হয় জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে তামাম মানুষকে হেদায়েত করার দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে চেপেছে। আপনি যে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী তা বোঝানোর সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না। সামনে বসা শ্রোতাদের ধৈর্যের প্রতিও কোনো শ্রদ্ধা থাকে না। এমনকি পেছনের চেয়ারগুলো যে খালি হয়ে যায় সেদিকেও হুঁশ থাকে না। শিল্পকলা নিয়ে কথা বলতে শুরু করে হোশিয়ারি শিল্পে চলে যেতেও হোঁচট খান না বটে, কিন্তু পেছন থেকে

খোঁচা খেয়ে গোস্বা হয়ে যখন বলেন, আমি আর আপনাদের বেশি সময় নেব না—তখন আমার খুব হাসি পায়। আর আমার পায়ে খুব জ্বালা ধরে তখন, যখন অনলবর্ষী বা সুকণ্ঠী যে-ই হোক না কেন, আমার সামনে দাঁড়িয়ে বা বসেই ফুঁ দিয়ে আমার সজীবতা পরীক্ষা করতে চান। অথচ আপনাদের অনেকের বুক ধুকধুকানি আমার সামনে এলেই আরো প্রবল বেগে শুরু হয়, কিন্তু আর কেউ না জানলেও আমি ঠিকই টের পাই। নিজের নার্ভাস চাপা দিতে আমার গায়ে ফুঁ দিয়ে যেসব ফাঁকা বুলি ছাড়তে শুরু করেন তাতে আর যাই হোক, দেশ ও দশের কোনো লাভ হয় না।

নিজেদের লাভ অবশ্য আপনারা ঠিকই গুছিয়ে নেন। কিন্তু অনেক সময় আমার মালিককে আপনারা ফাঁকি দেন। অথচ এই মালিকই আমাকে আদর-যত্ন করে ঠিক রাখেন। আমার লাইফ বলে যে একটা কথা আছে সেটাও বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট থাকেন আমার মালিক। এই গোবেচারা লোককেই আপনারা ন্যায্য পাওনা থেকে ঠকান, যদিও আমার সামনে দাঁড়িয়েই নানা ভঙ্গিমায় দু-হাত ছুড়ে দেশের সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি ও কল্যাণের কথার অনল ঝরিয়ে ঝড় বইয়ে দেন। আপনাদের এই দ্বৈত চরিত্রের দৈত্যগিরির সাক্ষী হয়ে নীরব থাকতে হয় আমাকে, আমার জাতি ভাইদেরকে।

হাটে-মাঠে-ঘাটে রোদ-বৃষ্টিতে ভিজে-পুড়ে আমরা যারা আপনাদের সত্য-মিথ্যার সাক্ষী হই, তাদের চেয়ে রেডিও-টিভির ছায়া সুশীতল কক্ষে আমাদের জাতভাই যারা আছে, তাদের অবস্থা আরো করুণ। প্রচারের ডামাডোলে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হয় তাদের। সরকারি মালিকানা বলে তেমন একটা আদর-যত্নও পায় না। তারা যখন বাইরে আসে, মাঠ-ঘাটে আমাদের পাশে দাঁড়ায়, তখন ওরা অনেক দুঃখের কথা বলে। বলে, ঠাণ্ডাঘরে থাকি বটে, কিন্তু লাইফ বুঝি যায় যায়। আরো অনেক কথাই বলে ওরা, কিন্তু তার সব কথা বলা যাবে না আপনাদের। কারণ আপনারা তো মানুষ, কখন কোথায় গিয়ে সত্য-মিথ্যার ভেজাল দেবেন তার তো ঠিক নেই। তার চেয়ে চুপ থাকাই ভালো। বোবার নাকি শত্রু নাই।

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি **'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র**
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

গুণগত শিক্ষা উন্নত জীবন
সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)
পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত
বিক্রির জন্য নয়